Imp 3912
27/8/07

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 622. June, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২২ সংখ্যা। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। জুন, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের কথা।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরলা।

(১)

আর তো অধিক দিন বাঁচিব না, আমার অসার জীবন-কাহিনী কিছু লিখিয়া রাখি। তোমাদের সহিত আমার আর কোনো সম্বন্ধ নাই—কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলিব না। শীঘ্রই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিব; এখনো হাত চলে,—এই বেলা লিখিয়া রাখি, আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ আর কেহ ইচ্ছা করেন,—লিখিবেন।

আমাদের নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত ....গ্রামে। গ্রামখানি প্রকাণ্ড, অনেক ভদ্র লোকের বাস এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিও বেশ সুসম্পন্ন। আমাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল, এক্ষণে খারাপ। প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু সেরামতের অভাবে তাহা শ্রীহীন। পিতা দরিদ্র ছিলেন, কষ্টে স্বষ্টে সংসার চালাইতেন, তাহার উপর আমরা তিনটি ভগ্নী ও একটি ভাই।—আরও অনেক হইয়া মরিয়া গিয়াছে। আমার বড় দিদির বিবাহ দিতেই বাবার যাহা কিছু ছিল তাহা গিয়াছে। মেজ দিদির বিবাহ আমাদের পাড়াতেই হইয়াছে। তাঁর স্বামী তাঁর অপেক্ষা মাত্র তিন বৎসরের বড়; ছোট বেলা থেকেই দুজনে বেশ ভাব-সাব ছিল; তারপর যখন মেজদিদির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় এবং বাবা বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা যার করিতে যাইতেছিলেন, তখন দাদাবাবু (মেজদিদির স্বামী) কলিকাতায় পড়েন, এবং সেই ভাবী পাত্রটি মাত্র এনট্রান্স পাশ অথচ দেড় হাজার টাকা চাহিয়াছে শুনিয়া বিনা টাকায় তিনি মেজদিদিকে বিবাহ করেন;—এজন্য চারি দিকে তাঁহার ধন্য

ধনা পড়িয়া যায়। মোট কথা মেজ'দিদির রূপেই সত্যেন্দ্র দত্ত মহাশয় ভুলিয়াছিলেন, —এ ছাড়া বাল্য-প্রণয়ের অঙ্কুর তো ছিলই। সেই থেকে এখানকার ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার মুখার্জ্জী সাহেবের স্ত্রীর কাছে মেজ-দিদি লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিখিতে আরম্ভ করেন,—অবশ্য পূর্ব্বেও মেজদিদি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। দাদা বাবু মুখার্জী সাহেবের বড় প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিবাহের এক মাস পরেই বড়দিদির মৃত্যু হয়। এখন আমরা তিন ভাই বোনে আছি। দাদা কলিকাতায় পড়েন, দাদা বাবু বাড়ীতেই থাকেন। এদিকে আমার বিবাহের বয়স হইয়া আসিল,—ত্রয়োদশ। লোকে বলিত আমি নাকি ভারি "সুন্দরী"। কেহ বলিত, "এমন রূপ রাজসিংহাসনেই শোভা পায়!" দাদাবাবু বড় বেহায়া, তিনি বলিতেন—"সরলা, আর দু'বছর পরে তোর দিকে আর চাওয়া যাবে না।" অর্থাৎ কিনা রূপের ঝলসে তাঁর চোখ ঠিক্‌রে যাবে—পুরুষ মানুষের চোখ কি না! ঠিক্‌রাইতে বড় বেশী ক্ষণ লাগে না। আমি বলিতাম,—"নীল চস্‌মা পরিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ো",—তিনি হাসিতেন।

বলা বাহুল্য বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। বাড়ীটি এর মধ্যেই বন্ধক পড়িয়াছে, বাবার অর্থ দিবারও তেমন ক্ষমতা নাই, এজন্য দত্ত মহাশয়ের যতই চোখ ঝল্‌সাক —আইবড় ছেলের বাপ জাতীয় যে এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাঁহারা বড় ঘেঁসিতেন না। মানুষ যতই যা হোক, রূপচাঁদের চেয়ে রূপ সে কোথায় পাইবে! তাঁদের চোখ রূপে ঝল্‌সায় না। একটি কলেজের ছেলের নাকি আমাকে দেখিয়া মন কেমন করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মাতুল পড়ার খরচ দিতেন, অতএব রুধির চাই। তিনি শেষে ক্ষেপিয়া দেশান্তরী হইয়াছেন, কি কোনো ঔপন্যাসিক চরিত্রের মত রোমান্টিক্ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাহা খবরের কাগজে লেখে নাই।

একদিন বৈকালে বাবা হঠাৎ মাকে বলিলেন, "মেয়ে সাজাও।" সাজিবার খুব বেশী কিছু ছিল না, তবে যা-হয় করিয়া মেজদিদি আমায় দালানের কাছে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আমি এলো চুলেই গিয়া হাজির হইলাম, বাবা হাত ধরিয়া বসাইলেন, মেজদিদির মতলব আমার মাথা-ভরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল-গুলি দেখানো,—তাই চুল বাঁধিলেন না।

আমি বড় বেহায়া,—ক্রমে নমুনা পাইবে। মেজদিদির মুখে শুনিলাম, যিনি দেখিতে আসিবেন সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। আবার "সংসার" করিবেন। এহেন রসের নাগর গুণের সাগরকে একবার ভাল করিয়া দেখিতে কোন্ মেয়েমানুষের না ইচ্ছা করে? কিন্তু চোখ তুলিতে লজ্জা করিতে লাগিল; তথাপি নড়িয়া ফুটিয়া, মাড়ি চাপিয়া, একবার চোখ তুলিয়া ফেলিলাম। গায়ে

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.
वर्ग संख्या বামাবোধিনী পত্রিকা,
Class No. বৈশাখ - আশ্বিন, মাঘ -
पुस्तक संख्या ফাল্গুন, ১৩২২,
Book No. জুন - অক্টোবর, ১৯১৫ -
रा० पु०/N. L. 38. ফেব্রুয়ারী - এপ্রিল, ১৯১৬
H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

গিরাণ, কাঁধে কোঁচানো চাদর, পরণে মিহি কালোপেড়ে ধুতি, পায়ে সাদা মোজা, গায়ে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে। চাপ দাড়ী, মাথায় তেড়ি, অধরে তাম্বুল-রাগ, চুল কালো। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে মেজদি মার কাছে বলিয়াছিলেন, "যে রকম মুখ তাতে বারো আনা চুল সাদা হইলে তবে মানাইত।" আমায় দেখিতে আসিয়া, দেখিলাম ভারি আহ্লাদ; ক্ষণক্ষণ ছিলেন, দাঁত কয়টি বাহিরেই ছিল,—সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে কি না! পুরুষ-মানুষেরা ভয়ানক প্রেমিক,—এক তিল প্রেম ভিন্ন থাকিতে পারেন না। কত উদ্ভ্রান্ত-প্রেমের প্রেমিকও নাকি বিবাহ করিয়া ফেলেন! —শত খুন মাপ।

তোমরা খেংরা লইয়া আসিবে—"কি! স্বামীর রূপের ব্যাখ্যা!" দোহাই তোমাদের—তখনো আমার বিবাহ হয় নাই, বিবাহের পর কি আর এ সব কথা মনে স্থান পাইত? ছি ছি! আর ঈশ্বরেরও বড় অন্যায়, তিনি কি অশুভ-ক্ষণেই মেয়েমানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার গায়ে আগুন চাপিয়া ধরিলেও পড়্ পড়্ করিয়া পুড়িয়া উঠে, মুখে কুই-নাইন পুরে' দিলেও মিষ্ট লাগে না, আর কানের গোড়ায় কেনেস্তারা বাজাইলেও ঐটার বাড়ি দিতে ইচ্ছা করে,—অবশ্য পুরুষমানুষে এ সব বিশ্বাস করে না। বলিয়াছি তো, আমি বেহায়া; তোমরা খেংরাই মার, আর হাতা-বেড়ী গোড়াইয়াই মুখে দাও, আমি সত্য কথা বলিবই বলিব। আমায় দেখিবার সময় দু একটি প্রশ্নও করিয়াছিলেন আমিও সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিয়াছিলাম,—ভারি খুসি!

২

বিবাহ যথাসময়ে এবং যথানিয়মেই হইয়া গেল। আমি ঘোমটা দিয়া বৌ সাজিয়া শ্বশুর-বাড়ী চলিলাম। এখনকার মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় বড় একটা কাঁদে না—কিন্তু আমি কাঁদিলাম, কেন কাঁদিলাম, তাহা তোমরা পুরুষ মানুষ কি বুঝিবে? তোমরা জানো মেয়ে মানুষের কান্না মায়া-কান্না, আর তোমা-দের আফিসের সাহেবের কানমলা খাইয়া যে কান্না তাহাই আসল কান্না। যাই হোক, আমি কাঁদিলাম। মা এবং মেজদিদিও কাঁদিলেন। যাইবার সময় মেজদিদি স্বামি ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ক স্ত্রী-জাতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়, গভীর গবেষণা-পূর্ণ একটি সুদীর্ঘ লেক্‌চার দিলেন। মাও ত্রুটি করিলেন না।

এ সকল শিক্ষা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের যাহা হইয়া থাকে আমার তাহা অপেক্ষা কোনো অংশেই কম ছিল না। সাবিত্রী উপখ্যান নলোপাখ্যান তো আমার কণ্ঠস্থই ছিল। পথে যাইতে যাইতে আবার সব ঝালাইয়া লইলাম, শানাইয়া রাখিলাম,—শ্বশুরবাড়ী গিয়াই অভিনয় আরম্ভ করিব।

রেলের পথ, যাইতে প্রায় পাঁচ ছয়

ঘণ্টা লাগিল; পথে দশ পনেরোটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, আমার স্বামী মহাশয় পানের দোনা হাতে করিয়া আমার পান দিতে আসেন, মুখে বলেন "নেও না নেও, আমার কাছে লজ্জা করিতে আছে?" মনে মনে বলিলাম, "একটুও না।" তোমরা যদি মেয়েমানুষ হইতে তবে বুঝিতে পারিতে, এই থিয়েটারী ধরণের লজ্জাভঞ্জন-রসাত্মক আপ্যায়িতে লজ্জা আরও ডাকিয়া আনে কিনা। যা'হোক তাঁর শ্রীচরণের দাসী সরলা সর্ব্বনাশী তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা পালনে ত্রুটি করে নাই।

আমি ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া ছিলাম। গ্রীষ্মকাল, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল। করি কি?—তোমাদের শাস্ত্রে বলে যে বিবাহ নামক লজ্জাকর ঘটনার পর হইতে এ বাঁদীর জাতির কালামুখ আর মনুষ্য-সমাজে দেখাইতে নাই!—কিন্তু তোমরাই নিয়ম করিয়াছ, আবার তোমরাই তবে অমন করিয়া মর কেন? তার সাক্ষী দেখ না কেন, যেখানে যেখানে গাড়ী থামে, অমনি সব রসিক ছোক্‌রা টিকিট্-কলেক্টরের দল মেয়ে-কামরার সম্মুখে আসিয়া হাট বসাইতে লাগিল। নব্য রসিক প্যাসেঞ্জারের দল কেবল মেয়ে-গাড়ীর সামনে দিয়া অকারণ যাওয়া-আসা করিবে,—তার মধ্যে আমার স্বামীর বয়সীও অনেক থাকেন, মনে মনে বলিলাম, "মুখে আগুন তোমাদের!"

আমার কামরায় আমাদের জাতির আর একটি জীব ছিলেন,—সুন্দরী বটে, বয়সও অল্প, চোখে চসমা, পায়ে জুতা, হাতে একখানি ইংরাজি খবরের কাগজ, মুখ খোলা, চাহনি সপ্রতিভ এবং গম্ভীর। বুঝিলাম বিলাতী বাগানের দেশীয় ফুল! সুন্দরী বটে, বলিহারি রূপ! কিন্তু কৈ এর মুখের পানে তো কেহই চাহে না, যেন চাহিয়া থাকিতে সাহসই করে না! যত বক্র দৃষ্টি এই ঘোম্‌টার মধ্যে! একবার ভাবিলাম মুখটা খুলিয়া দিই, তাদেরও গোজন্ম সার্থক হোক, আমার মুখেও একটু বাতাস লাগুক, তাহা আর করিলাম না,—কি জানি যদি পাপ হয়!

একবার আমার স্বামী মহাশয় আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলে সেই স্ত্রী-লোকটি আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ ভদ্র লোকটি কি তোমার স্বামী?" তাহার উপর বড় রাগ হইল, কারণ দেখিলাম জিজ্ঞাসার সুরটি যেন একটু ব্যঙ্গ রসে মাখানো। কি করি?—ভদ্রতার খাতিরে তিন চারি বার ঢোক্ গিলিয়া উত্তর দিলাম "হুঁ"। বলি রাগ হয় না গা?—তোমরা যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পথে যাইতে যাইতে হোঁচোট্ খাইয়া পড়িয়া যাও, তখন আগে চারি দিকে তাকিয়ে দেখ, কেহ দেখিতে পাইল কিনা; যদি দেখ অমুখ দেখিয়া ফেলিয়াছে, তবে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত কর কি না?

অবশেষে একটি ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে, স্বামী মহাশয় মহা আগ্রহের সহিত গাড়ীর দরজা খুলিয়া বসিলেন,

"এস!" অতি লজ্জার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া জড়-ভরতের মত আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। গাড়ীর দরজার কাছে যেতেই স্বামী মহাশয় হাত ধরিয়া নামাইলেন এবং হাত ধরিয়াই লইয়া চলিলেন, লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সেখানে বাবা আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এখন সঙ্গে বাপের বাড়ীর পুরুষমানুষ কেহ নাই। মেজ-দিদির চাকরাণী হিমী সঙ্গে আছে, কিন্তু স্বামী মহাশয় আসিয়া নিজে আমার হাত ধরিলে সে আর কি করিবে—গো বেচারীর মত পেছনে পেছনে আসিতে লাগিল। গরম প্লাট্‌ফরমে পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িয়া উঠিল। কিন্তু মেয়েমানুষের অনেক সয়—আমারও সহিল। যথাসময়ে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম।

৩

আজ আট দিন হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছি। বিবাহের আনুষঙ্গিক আচার-ব্যবহার সবই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে বাবা আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু এখান হইতে স্পষ্ট জবাব গিয়াছে "এখন পাঠানো হইবে না;" কি জন্য তাহা পরে জানিতে পারিবে।

শ্বশুর-বাড়ীর পরিচয়ে তোমাদের বিশেষ লাভ নাই; তবে একটু শুনিয়া রাখ,—এদের বিষয়-সম্পত্তি বেশ আছে, বাড়ীটিও বেশ জম্‌কালো, উপর নীচে দশ বারোটি কুঠারী আছে, বাগান-বাগিচাও আছে, এঁরা দুই ভাই। আমার দেবর কলিকাতায় চাকরী করেন, স্বামী মহাশয় পেন্‌সন্ লইয়া বাড়ীতে আছেন,—পেন্‌সনের বয়স অবশ্য হয় নাই, তবে চাকরী করিতে আর ভাল লাগে না বলিয়াই নাকি ইচ্ছা করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সপত্নী একটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। আরও কতকগুলি নাকি হইয়া মরিয়া গিয়াছে। কন্যাটিই বর্ত্তমানে বড়; কিন্তু সে বিধবা এবং শ্বশুরালয়েই থাকে—তাঁরা বিবাহের সময়েও নাকি পাঠান নাই, তাহার পক্ষে এ বিবাহ দর্শন করা বড় সুখকর হইত বলিয়াও বোধ হয় না। ছেলেগুলি ছোট, আহা তাদের মা নাই। সর্ব্বদা পিসীর কাছেই থাকে, আমার কাছে বড় আসিতে চাহে না। আমার ছোট জা'য়ের উপর ষষ্ঠীর কিছু বেশী রকম অনুগ্রহ দেখিলাম। পাঁচ ছেলে ছয় মেয়ে—এখনো বেশ বয়স আছে। তিনি আমায় দিদি না বলিয়া 'বড়-বৌ' বলিতে লাগিলেন। মানুষটি বেশ, কথাগুলিও বেশ মিষ্ট, স্বভাবটা যেন একটু ভাল-মানুষ-গোছের। তিনটি মেয়ে পার করিয়াছেন। তারা শ্বশুর-বাড়ী থাকে, এখনো তিনটি বাকি। আমার ছেলেদের পোষ মানাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু তারা আমার কাছে বড় ঘেঁসে না—(তোমরা পুরুষমানুষেরা বলিবে, "কালামুখী? তোর বিয়ে না হ'তেই ছেলে-মেয়ে কোথা হতে আসিবে রে?"—প্রভু সকল, এ সব

তোমাদেরই মহিমা, তোমাদেরই লীলা!) সংসারে আর আছেন একটি বিধবা খোঁড়া রমণী—তিনি আমার ননদিনী রায় বাঘিনী। মনুষ্যটি জবরদস্ত বটে। আমি আসা অবধি আমার লাগাম কসিয়া রাখিয়াছেন—দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, আসকারা পাইলে পাছে বেয়াড়া হইয়া যাই; আমিও ভয়ে জুজু হইয়া আছি—শঙ্করে সবাই ভক্ত।

এ সব কথা যাউক, আমি এখানে আসিয়া অবধি স্বামি-সেবা-রূপ ব্রত অনুষ্ঠানের খুব প্রশস্ত সুযোগ পাইয়াছি। কয়জন ভাগ্যবতীর এমন জোর কপাল? ইতিপূর্ব্বেই আমার স্বামীর নাকি কি ব্যারাম ছিল—এ নাকি কি বিলাতী ব্যারাম, বড় মানুষদেরই হয়! আজ চারি দিন বড় বাড়িয়াছে,—শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, সেবা-শুশ্রূষা আমিই করিতেছি, সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় না, দুপুর বেলা একটু আঁচল পাতিয়া গড়াগড়ি দিতে গেলে আমার ননদ ঠাকুরাণী তাঁহার আতার বিচির মত মিশি দেওয়া দাঁতগুলি বাহির করিয়া কর্কশস্বরে আমার মাতৃ-পিতৃ-উচ্চারণ পূর্ব্বক, বুঝাইয়া দিয়া থাকেন যে, স্বামি-সেবা করিয়া আমার বিফল নারীজন্ম সার্থক করাইবার জন্যই তাঁহার সহোদর এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এই শেষ বয়সে, "পরের বালাই ঘাড়ে করিয়াছেন।" তাঁর সেই সময়কার মুখ-ভঙ্গিমা দেখিলে, ছোট বেলায় একবার চিড়িয়াখানায় গিয়া ছিলাম, তথাকার এক প্রকার জীবের কথা মনে পড়িত।

জামাতার অসুখের কথা শুনিয়া বাবা দেখিতে আসিয়াছেন, আর অনুনয় বিনয় করিয়া যদি অনুমতি পান, তবে আমাকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু আমার স্বামীর অসুখ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বেশী কথা কহিবারও শক্তি রহিল না, বাবা ফিরিয়া গেলেন। আমার স্বামী আজ কাল আমায় আর বড় কিছু বলেন না; আমায় দেখিতে যাইয়া তাঁর মুখে যে হাসির প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, আজ কাল তাহা নিবিয়া গিয়াছে! তাহাতে আর তেল নাই—শুদ্ধ সলিতা আছে মাত্র।

একদিন আমি ঘরে গেলে, কিছুক্ষণ ম্লান দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন; আমি জড়োসড়ো হইয়া, ঘোমটা টানিয়া, দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দেখিলাম তাঁহার চক্ষে জল; ছল্-ছল্-চক্ষে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীণকাতর-স্বরে আমায় বলিতে লাগিলেন—"আমায় ক্ষমা করিয়ো, আমি মহাপাতকী, আমি নর-রাক্ষস, বুঝিবা জন্মের মত তোমায় ভাসাইলাম,—" কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল, আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মনোবেগ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিলেন—"ধিক্ আমাদের সমাজের নিষ্ঠুরতাকে,—আমার মত পাষণ্ডের শাসন নাই! পুরুষেরা যতদিন আমাদের

সমাজে যথেচ্ছাচার—" কি বলিতে যাইতে ছিলেন, আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। জল চাহিলেন, জল খাওয়া বারণ, ডাবের জল ছিল, আনিয়া পান করাইলাম, আমার কান্না আসিয়াছিল, চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছিল, বুকের মধ্য হইতে যেন কি-একটা ভারী পদার্থ উঠিয়া আসিয়া কণ্ঠে বাধিয়াছিল, ঢোক গিলিতে পারিতেছিলাম না। কি মনে হইয়া যে তখন কান্না আসিতেছিল, এখন তাহা ভাল মনে নাই—সে আজ দশ বৎসরের কথা। ডাবের জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বলিলেন—"তোমার দাদা শীঘ্র ডাক্তারি পাশ করিবেন, ঈশ্বরেচ্ছায় দু'পয়সা রোজগার করিবেন, তোমার কষ্ট হইবে না। এখানে থাকিয়ো না—" উপযাচক হইয়া এক দিনও কথা কহি নাই, আজ কহিলাম,—জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কি শরীর বড় খারাপ?" তিনি বলিলেন, "না না, তেমন খারাপ নয়, বেশ আছি, তবু—" কি জানি কেন, আপনা আপনিই যেন দময়ন্তীর সেই কথাটি মনে আসিল,—আপন মনে বলিতে লাগিলাম :—

"যদি মাং ত্বং মহারাজ ন বিহাতুমিহেচ্ছসি।
তৎ কিমর্থং বিদর্ভাণাং পন্থানং মাং
ন উপেযাসি॥

আবার ভাবিলাম "কি জানি—আমি কি বুঝি? মন্দ কথা ভাবিতে নাই—আর ভাবিব না।" এমন সময় সিঁড়িতে জুতার মস্‌মস্ শব্দ হইল, বুঝিলাম ডাক্তার বাবু আসিতেছেন, আমি আমার জায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তখন অপরাহ্ণ, ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে আমার ননদ আমায় বলিলেন, "বড় (!) বৌ, আজ তুমি ছোট বৌএর ঘরে শুইয়ো, এ ঘরে আর তোমার আজ শুইবার দরকার নাই—ও ঘরে আর যেয়ো না।" তথাস্তু। মনে করিলাম আজ বুঝি ভালই আছেন, তবে? আমার মলের শব্দে হয়তো তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হইবে, এই জন্য যাইতে বুঝি বারণ করিলেন। আর আজ বুঝি ঠাকুরঝির আমার উপর দয়া হইয়াছে, তাই আমায় আজ ঘুমাইতে দিবেন। আজ আর তবে ওদিকে যাবো না। আমি অনেক সময় অনাহূতভাবেই "তাঁর" ঘরে যাইতাম—বিয়ের ক'নে হ'লে কি হয়? বড়বৌ যে!

রাত্রে যথাসময়ে আমার জায়ের ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, তাঁর কোলের মেয়েটি এরই মধ্যে আমার বড় 'নেওটো' হইয়াছে, সে তাহার মায়ের কাছ থেকে উঠিয়া আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল, বলিল, "দেতাইমা, আমি তোমার তাছে ছোবো।" তাহাকে কোলের মধ্যে লইয়া শয়ন করিলাম। একে তো মেয়েমানুষের ঘুমের বদ্‌নাম আছেই, তার উপর আজ বিছানার উপর শুইয়াছি (অন্য দিন আমি প্রায় আঁচল পাতিয়া "তাঁর" পালঙ্কের নিকটে মেঝেয় শুইতাম), মনটাও একটু সুস্থ আছে, কারণ মনে করিলাম, আজ বুঝি ডাক্তার বাবু

অনেকটা ভাল দেখিয়া গিয়াছেন, তন্দ্রা আসিতে লাগিল, কিন্তু কি-জানি-কেন, পূর্ণ-নিদ্রা আসিল না।

অন্য দিন জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকি, আজ একটু হাতাপাতা মেলাইয়া একটু আরাম করিয়া শুইয়াছি। গ্রীষ্ম-কাল, ঘরের জানালা সব খোলা ছিল, নৈশ নিদাঘের মৃদুমন্দ সমীরণ জানালা দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া ঘরে আসিয়া, আমার পরণের ফিন্‌ফিনে পাতলা কাপড়-খানিকে এখানে-ওখানে ইচ্ছামত নাড়া চাড়া দিয়া, কখনো বা কাপড় ফুঁড়িয়া আমার ঘর্ম্মাক্ত চর্ম্মে একটু ফুঁ দিয়া, আবার অপর জানালা দিয়া বাহির হইয়া, আবার কাহার ঘরে, আমার মত কাহারো সঙ্গে রসিকতা করিতে চলিল। কোনো বালাই নাই। মনে ভাবিলাম "বাপু। এখন বড় স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছ, পরকালের ভাবনা একবার ভাবিতেছ না। একবার মেয়েমানুষ হইয়া জন্মাইয়া স্বামি-সেবা কর, নহিলে স্বর্গে যায়গা পাবে না যে—" কে শোনে? আমার সর্ব্ব শরীরে অলসের মদিরা ঢালিয়া রাখিয়া অম্লান-বদনে চলিয়া গেল। আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম "আমার তো বিবাহ হইল, সকলেরই হয়, আমারও হইল, মেজদিদি দাদাবাবু, মা সকলে শিখাইয়াছেন স্বামী দেবতা, আমিতো এখন দেবতা পাইয়াছি; কিন্তু আমি ছেলে মানুষ, দেবতা লইয়া কি করিব? দেবতা লইয়া কি করিতে হয়? আমায় কে শিখাইবে! বুঝি মানুষের সঙ্গে বিবাহ হইলে আমার আহ্লাদ হইত। আচ্ছা, মানুষের সঙ্গে দেবতার কেন বিবাহ হয়? সকলের স্বামীই কি তবে দেবতা? কৈ, দাদাবাবুকে তো কেমন মানুষের মত বোধ হয়। হায়! আমার স্বামী যদি একটু মানুষের মত হইতেন! তাঁর অসুখ, মুখের দিকে তাকাইলে বড় দুঃখ হয়, মেজদিদির শ্বশুরের যখন বড় অসুখ করিয়াছিল, তখন তাঁর দিকে চাহিয়া আমার ঐ রকম বড় দুঃখ হইত। মা কালী, তাঁকে ভাল কর। তিনি কত লেখাপড়া জানেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমায় তিনি সব বুঝাইবেন, কি করিলে তাঁর তৃপ্তি হয় আমি কেমন করিয়া বুঝিব? ঠাকুরঝি যাহা করিতে বলেন আমি তাই করি। তাহাতে কি তাঁহার সেবার ত্রুটি হয়? আমার কি পাপ হয়? তবে কি হবে?—এবার আমি বাড়ী গিয়া মেজদিদির কাছে ভাল করিয়া শিখিব।"

হাই উঠিতে লাগিল, চোখ টানিতে আরম্ভ করিল, ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৪

পর দিবস প্রাতে বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল!—ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, এলো থেলো হ'য়ে এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিলাম, হঠাৎ যেন কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল, —ব্যাপারখানা কি!

তখন নেহাত খুকীটি নই,—ঠাকুরঝির রোদনের বাক্‌বিন্যাসেই সব বুঝিলাম,—আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আমার তখনকার মনের ভাব আমি তখন নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, তা আর আজ দশ বৎসর পরে মনে করিয়া তোমাদের কি বুঝাইব?

আমার তখন যে কি ভাবিতে হইবে, কি করিতে হইবে, ঘর থেকে বাহির হইব কি না, কিছুই যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ বিছানায় বসিয়া ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। বেশ শুনিতে পাইলাম, ঠাকুরঝি কাঁদিয়া আছাড় পিছাড় করিতেছেন, আর কপাল ভাঙিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিতেছেন "ওরে কি কালনাগিনী বৌ ঘরে এনেছিলাম রে—" ইত্যাদি। বুঝিলাম এই সর্ব্বনাশীই যত অনর্থের মূল।

স্বামী মরিলে কাঁদিতে হয়, এটা বুঝিবার মত বয়স তখন আমার হইয়াছিল; কিন্তু আমার ঠিক যে তখনই কান্না আসিয়াছিল, তাহা নহে। বলিয়াছি তো, আমি তখন কি করিব, কি ভাবিব, কার কাছে যাইয়া দাঁড়াইব, কিছুই বুঝিয়া পাইতেছিলাম না। একটু পরে কিন্তু আমি কাঁদিয়াই ফেলিলাম, চোখ রগড়াইয়া রগড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিয়া যেন আমার বড় তৃপ্তি হইতে লাগিল, কিন্তু তখন মনে কি ভাবের উদয় হইয়া কাঁদিতেছিলাম তাহা আমার যেন এখন ঠিক মনে আসিতেছে না। যেন তাহা অনেকটা অভিমানেরই কান্না, যেন কোনো আপনার জনের হাতে মার খাইয়াই সে কান্না। যেন মা ও মেজদিদি ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন, আমি ঘুমাইয়াছিলাম, ডাকিয়া লইয়া যান নাই, যেন সেই ঘুম থেকে উঠিয়াই এই কান্না; কিম্বা যেন বাবা, মা, দাদা, ও মেজদিদির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, পথে প্রান্তরের মাঝে আমি হারাইয়া গিয়াছি, আর এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, কালো মেঘে আকাশ ছাইয়াছে, ঝকমক্ বিদ্যুৎ চমকিতেছে, যে যাহার আশ্রয় পানে ছুটিয়া চলিয়াছে,—আমার পানে কেহ চাহিতেছে না, আর আমি বালিকা, একাকিনী, প্রান্তরমাঝে নিরাশ্রয়া, পথ-হারা, অনাথিনীর মত কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। কড় কড় মেঘগর্জ্জনে আমার সে ক্রন্দনধ্বনিও ঢাকিয়া ফেলিতেছে,—এ যেন ঠিক সেই কান্না। এত দিন পরে তোমাদের কেমন করিয়া বুঝাইব, সে কান্না কেমন কান্না? সে কান্নার মধ্যে রাগ, দুঃখ, অভিমান এই তিনে মিশিয়া কেমন একটা কি ভাব,—তাহাতে শোকের চিহ্নমাত্রও ছিল না। সে কান্না স্বামিশোকের কান্না বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়,—তাহা আমি বলিতে বসি নাই।

* * *

সপ্তাহ কাল অতীত—আমি বিধবা হইয়াছি। বাবা আসিয়াছেন, আমায় লইয়া যাইবেন, এবার অনুমতি পাইয়াছি, আজ মার কাছে যাইব, মেজদিদির কাছে যাইব, দাদা বাবুর কাছে যাইব।

যে দিন আমি আইবড় মেয়ে চুল এলো করিয়া—র সম্মুখে আসিয়া রূপ দেখাইতে বসিয়াছিলাম, সেদিন হইতে আজিও এক মাস অতীত হয় নাই, এলো চুল ছিল, বাঁধা হইল, আবার এলাইয়া বাড়ী চলিলাম, সাদা সিঁথি ছিল, সিন্দুর পরিলাম, আবার মুছিয়া বাড়ী চলিলাম। বাবার কাছে গহনা পরিতে পাই নাই,—গা-ভরা গহনা পাইলাম, পরিলাম, আবার খুলিয়া বাড়ী চলিলাম। এক মাসের মধ্যে আমার সব হইল, সব ফুরাইল! মুহূর্ত্তমধ্যে জন্মিলাম, বাঁচিলাম, মরিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে ফুটিলাম, ঝরিলাম, শুকাইলাম। মুহূর্ত্ত কালের জন্য জ্বলিয়া উঠিলাম, তখনি নিবিলাম। আজ আমার সব ফুরাইল! সবই কি ফুরাইল? না, কেবল সুখের দিন ফুরাইল—দুঃখ কি ফুরায়?

আমার "আড়াই দিনের বাদসাহী" আড়াই দিনেই শেষ হইল, আমার জীবন-নাটকের একই গর্ভাঙ্কে কুমারী সাজিলাম, এয়ো সাজিলাম, বিধবা সাজিলাম। তিন লীলা একই আসরে দেখাইলাম। আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, একই পরিচ্ছেদে সম্পন্ন হইয়া গেল। আর কি চাই? "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি"র গুভীক্ষায় বাবার সঙ্গে বাড়ী চলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
এম, এ।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একাদশ অধ্যায়।

আদম পুরা।

বারাণসীধামের উত্তর-পূর্ব্ব দিক ব্যাপিয়া আদম পুরা মহল্লা অবস্থিত। উত্তরে রেলওয়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে কোতোয়ালী, দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গা এবং পশ্চিমে জাইত পুরা। মহল্লার দক্ষিণাংশ ভেদ করিয়া চেতগঞ্জ হইতে রাজঘাট এবং মচ্ছোদ্রি হইতে পুল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা চলিয়া আসিতেছে। রাস্তা ও নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বাটীগুলি পাকা এবং মধ্যবিৎ হিন্দুদিগের দ্বারা আবাসিত। মহল্লার কেন্দ্রটি কাঁচা এবং গরীব মুসলমানদিগের আবাস-ভূমি। উত্তর দিকে অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে "লড্ডু সুরিয়া" এবং "গোয়ালা গদাই" সুবৃহৎ। এই স্থান হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। তিলিয়া নালা ঘাট হইতে

বরুণার উপরিস্থ পুলকোহানা নামক সেতু পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আড়ভাবে মিলিত হইয়া সারনাথ-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এ স্থানটিতে ধ্বংসাবশেষ চিহ্নগুলি বিদ্যমান আছে। এখানকার বাজারগুলির প্রসিদ্ধি নাই। যতদিন নদীর বাণিজ্য ছিল, ততদিন স্থানটিও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। এখন নদী অতিক্রম করা সহজ হওয়াতে বাণিজ্যটি লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং স্থানটিও অবনতি-দশাগ্রস্ত। পুরাকালে যে এই স্থানটি বহুজনাকীর্ণ ছিল, বহু পুরাতন বাটীগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মচ্ছোদরী পুষ্করিণী এক্ষণে মিউনিসিপাল উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে কামেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। কিন্তু পুষ্করিণীর অনস্তিত্বে জলসমাসমও বিরল হইয়াছে। তিলিয়া নালার সন্নিকটে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মস্‌জিদ আছে। ইহা স্তম্ভত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিরোদেশে গম্বুজ শোভা পাইতেছে। লোকের বিশ্বাস যে ইহা বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুলজার মহল্লায় মকদম সাহের নামে একটি সমাধিস্থান আছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সন্নিকটে একটি মস্‌জিদ আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। রেলওয়ের পরেই পাগং সাহিদ নামে একটি সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে হইতে বরুণার তট পর্য্যন্ত বহু পুরাতন বাটীর অস্তিত্ব দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এখানে পূর্ব্বে লোকেরা বাস করিত, কিন্তু তাহা এক্ষণে ফলকর উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। আদম পুরা মহল্লায় লাট ভৈরব নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রস্তর স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে একটি মন্দির ছিল, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তাহা চূর্ণীকৃত করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দের হাঙ্গামায় এই স্তম্ভটিকে মুসলমানগণ ভাঙ্গিয়া ফেলে। হিন্দুরাও প্রতিহিংসা স্বরূপ মস্‌জিদটি চূর্ণ করিয়া ফেলে। উত্তর দিকে মুসলমানদিগের গোরস্থান আছে, তন্মধ্যে রওজা অবস্থিত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জাইত পুরা।

আদম পুরার পশ্চিম দিকে জাইত পুরা মহল্লা অবস্থিত। ইহা পশ্চিমে চেতগঞ্জ, উত্তরে রেলওয়ে এবং দক্ষিণে কোতোয়ালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর দিকটা ফাঁকা, নালা ডোবা, মাটির ঢিবি প্রভৃতির অভাব নাই—স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যও হইয়া থাকে। পশ্চিমার্দ্ধটাও ন্যূনাধিক পরিমাণে ফাঁকা—উদ্যান এবং সুন্দর অট্টালিকা যে নাই তাহা নহে। পূর্ব্বার্দ্ধের কেন্দ্র-স্থানটি কাঁচা। মুসলমান এবং ইতর শ্রেণীর হিন্দুগণ এইখানে বাস করে। এখানকার মুসলমানেরা কিংখাপ বুনিয়া থাকে। দক্ষিণ দিকে লোকের আবাস এবং ইহাই অওসান গঞ্জের ব্যবসার স্থান। অওসান গঞ্জটি বাবু অওসান সিংহ দ্বারা স্থাপিত। পল্লীটি সুবৃহৎ, ইহাতে বাজারও আছে। ইহার সন্নিকটে লোগেশ্বরের মন্দির। ইনি ধনাঢ্যদিগের উপাস্য

দেবতা। যোগেশ্বরের মন্দিরের মেজেটী পালিশ করা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দ্বারের সম্মুখে একটি ষাঁড়-মূর্ত্তি আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা দেবগণ সমবেত হইয়া হোম করিতেছিলেন, এমন সময়ে আহুতি-প্রদত্ত বস্তু ভেদ করিয়া প্রস্তরাকারে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। মূর্ত্তির ঠিক উপরে একটি পাত্র আছে। গ্রীষ্মকালে পাত্রটিতে জল রক্ষিত হয়। ছিদ্র দিয়া বারিবিন্দু মূর্ত্তির উপর পতিত হইতে থাকে। নিকটে নাগকূপ নামে একটি পুরাতন কূপ আছে। কবে যে নাগকূপ খনন করা হয় তাহা বলা দুঃসাধ্য। কাশীখণ্ডে কিন্তু ইহার উল্লেখ আছে। কূপের সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত। জলের নিম্নদেশে একটি লৌহচাদর নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহার নিম্নে আরও একটি কূপ বিদ্যমান আছে। উক্ত কূপে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। একটা সিঁড়িতে তিনটী সর্পমূর্ত্তি অঙ্কিত। মেজেতে মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। সর্প তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। শ্রাবণ মাসে একটি মেলা হয়। মেলাটি দুই দিন থাকে। প্রথম দিনে স্ত্রীলোকেরা এবং দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ মেলায় আসেন। এই সময় নাগেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। জাইত পুরার উত্তর দিকে বাদেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। পশ্চিম দিকে সতী ইমলী নামক স্থান। এখান হইতে রামলীলার সমারোহ আরম্ভ হইয়া চিত্রকোটে যাইয়া সমাপ্ত হয়। জগৎগঞ্জে চিত্রকোট নামক স্থান অবস্থিত। বাবু জগৎ সিংহ জগৎগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। সারনাথের উপকরণাদি লইয়াই তিনি এই গঞ্জ স্থাপন করেন। সতী ইমলী রাস্তা হইতে মস্তপ্রস্তরের স্থান পর্য্যন্ত ঈশ্বর গাঙ্গী নামক যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ভাদ্র মাসে "কজরি মেলা" হইয়া থাকে। মেলার দিনে রমণীগণ উপবাস করে এবং ঈশ্বর গাঙ্গীতে স্নান করিয়া থাকে। উক্ত মেলার জনতা কম হয়। ভদ্র ব্যক্তির সমাগম এই মেলায় হয় না। ঈশ্বর গাঙ্গীতে একটী পুরাতন কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই কূপের নিম্ন প্রদেশে একটী রাস্তা অবস্থিত, তদ্দ্বারা এলাহাবাদে গমন করা যাইতে পারে। অপর জনশ্রুতি এইরূপ যে, উক্ত রাস্তা পাতালপুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অওসান গঞ্জের সন্নিকটে বড় গণেশের একটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এখানে তীর্থ-সেবীদিগের বিশেষ ভীড় দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ঠা ভাদ্র এখানে "ঢেলা চৌথ মেলা" হইয়া থাকে। রাত্রে নষ্টচন্দ্র দেখিয়া লোকে অপরের বাটীতে ঢেলা নিক্ষেপ করে। লোকের বিশ্বাস নষ্ট চন্দ্র দেখিলেই সে বৎসরে সে কোন অপকর্ম্মে বৃথা অভিযুক্ত হইবে। সুতরাং মুক্তির উপায় লোকের বাটীতে ঢেলা ফেলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পুলিশ কিন্তু এই অপকর্ম্মটি আংশিক রোধ করিয়াছে। এই পল্লীর পূর্ব্ব দিকে দারা নগর। ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা

সিকো এই স্থানে বহুকাল যাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। অদূরে "আড়াই কাঙ্গুরা" নামক একটী মস্‌জিদ বিরাজিত। বারাণসীধামে যে কয়েকটি সুন্দর মস্‌জিদ আছে তন্মধ্যে "আড়াই কাঙ্গুরা" একটি। আরও উত্তর দিকে আলাইপুরা মহল্লায় "বকরিয়া কুণ্ড" নামে একটি পুষ্করিণী অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহু পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস যে, সেগুলি বৌদ্ধদিগের। ১লা জ্যৈষ্ঠ "বকরিয়া কুণ্ডে" গাজিমিয়ার "গাজিমিয়া" মেলা হইয়া থাকে। এ মেলাটি মুসলমানদিগের। সুলতান গজনবির ভাগিনেয়ের সম্মানার্থ এই মেলা হইয়া থাকে। উক্ত সুলতান তাঁহার শ্যালক সালারসাহুকে ভারতবর্ষে কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রেরণ করেন। প্রবাসকালে তাঁহার স্ত্রী সাতারি মুল্লা আজমির সহরে একটী পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রটি সালার মস্‌উদ নামে খ্যাত। ইনি উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিন্দুদিগের সহিত রণে হত হন। অযোধ্যার অন্তঃপাতী ব্যারাইচ নামক স্থানে তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। মুসলমান ধর্ম্মের জন্য ইনি প্রাণোৎসর্গ করেন বলিয়াই ইনি পরে মুসলমান উল-সুহদা নামে খ্যাত হন। গাজিমিয়ার মেলায় নীচজাতীয় হিন্দু ও মুসলমান স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য যে, পাপস্রোত অবাধে বহিয়া থাকে। বকরিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে ফকরুদ্দিন আলাইয়ের দর্গা অবস্থিত। উক্ত কুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৬০০ গজ দূরে ৩২ খম্বা নামে একটী সমাধিস্থান আছে। ইহা ৩২টি স্তম্ভোপরি স্থাপিত। কতকগুলি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলাতে ইহা ২৪টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান আছে। লোকের বিশ্বাস যে, ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পিতৃভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তিনি প্রফুল্লকে বসিতে বলিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল বসিলেন না। প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়া রমার মাতা ভীতা হইলেন। কি যে একটা ঘটিয়াছে তাহা তিনি অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্ব দিবসে প্রাপ্ত পত্র দুইখানি প্রফুল্ল রমার মাতার হাতে দিয়া বলিলেন "মা, আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, শঠ, আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনারও অযোগ্য। মা, এ হতভাগ্য আজি জন্মের মত আপনার নিকটে

বিদায় লইতে আসিয়াছে। এ অভাগাকে বিস্মৃত হইয়া যাইবেন—মনে করিবেন—"। প্রফুল্ল আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, অশ্রু আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রমার মাতা বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, প্রফুল্লের সহিত একটী কথা কহিবারও তিনি অবকাশ পাইলেন না।

কিছুক্ষণ পরে প্রফুল্লের প্রদত্ত পত্র দুই খানি পাঠ করিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার বাসনা করিয়াছিলাম, তার ফল এই প্রকারই হওয়া উচিত!"

৫

আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে নব বর্ষার মধুর যামিনীতে প্রফুল্ল কুমার জীবনের নূতন পথে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তিনি কোন ওজর আপত্তি করিলেন না, শাস্ত্রমতে মন্ত্র পাঠ করিয়া অনুপমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনুপমা তাঁহার ইহ পর লোকের সঙ্গিনী ধর্ম্মপত্নী হইলেন। কিন্তু তিনি যে, এ বিবাহে আন্তরিক সুখী হয়েন নাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। আনন্দবাবু প্রভৃতি সকলেই সুখী হইয়াছিলেন বটে, কারণ এ, পি, ঘোষ গহনায় ও নগদে সর্ব্বসমেত প্রায় আট হাজার টাকা দিয়াছিলেন, ফুলশয্যা প্রভৃতিতেও বিস্তর মূল্যবান্ সামগ্রী দিয়াছিলেন। দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রতিবেশিবর্গ সকলে এ, পি, ঘোষের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বধূ দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন "যেমন ছেলে সে রকম বৌ হয় নি।" আবার অনেকে বলিলেন "তা হোক্, তা হোক্ বয়েস হোলে বেশ হবে, বড় ঘরের মেয়ে এ রকম হোয়ে থাকে।" এ প্রকার প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। বুঝিলেন এ প্রশংসা নব বধূর নহে, বধূর ধনবান্ পিতার ধনের। হায়! রমা! তুমি যদি ধনাঢ্যের কন্যা হইতে!

প্রফুল্লের বিবাহ তো হইয়া গেল, কিন্তু প্রফুল্লের বিবাহের নিমিত্ত যাঁহার এত আগ্রহ ছিল, প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া যিনি 'চরিতার্থ' হইবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রফুল্লের সেই পিতামহী প্রফুল্লের বৌ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন কি? না। একে তো বধূ প্রফুল্লের অনুরূপ সুন্দরী নহে—তাহাতে বধূর যেরূপ উদ্ধত গর্ব্বিত স্বভাব, বৃদ্ধা তাহা দেখিয়া আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কত যত্নের, কত সাধনার প্রফুল্লের বৌ, বৃদ্ধার ইচ্ছা নাতবৌকে কোলে নিয়ে আদর করেন, কাছে বসিয়ে উপকথা বলেন, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বৌ উপকথার নাম শুনিয়া হাসেন! যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক

প্রফুল্ল আজিও ঠাকুর মার কাছে বসিয়া উপকথা শুনিতে ভাল বাসেন, তাঁহার পত্নী বৃদ্ধার উপকথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসেন। তিনি বৃদ্ধাকে ভূত-গ্রস্ত রোগী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধার নিকটে বসিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। স্ত্রীর ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাইতে লাগিলেন। কোথায় সরলা রমা, আর কোথায় এই গর্ব্বিতা অনুপমা? প্রফুল্ল বহু কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া থাকিতেন, এবং "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ" ভাবিয়া পিতার প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করিতেন। এই-রূপ নৈরাশ্য ও অশান্তিতে প্রফুল্লের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। তিনি প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এম্, বি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু প্র্যাকটীস্ করিতে সক্ষম হইলেন না।

যাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, জীবনে সুখ নাই, মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সে লোকের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবে কি প্রকারে?

যদি অনুপমার স্বভাবটী এরূপ না হইয়া কোমল হইত, তাহা হইলে বোধ হয় প্রফুল্লের এত কষ্টের কারণ হইত না। কর্ত্তব্যের ভার বলিয়াও তিনি মনকে কতকটা প্রবোধ দিতে পারিতেন, কিন্তু অনুপমার এই প্রকার কঠোর গর্ব্বিত স্বভাব তাঁহাকে আরও যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

আমাদের দেশের কোনও বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন "যাহারা বিষয় করে, তাহাদের প্রাণে অহঙ্কার থাকে না, কিন্তু যাহারা সে বিষয় ভোগ করে তাহারা ধরাকে প্রায়ই সরা জ্ঞান করিয়া থাকে। আমাদের ব্যারিষ্টারদুহিতা অনুপমা এ কথার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দিবা রাত্রি এইরূপ মনাগুনে দগ্ধ হইয়া প্রফুল্লের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। আজ জ্বর, কাল পেট ফাঁপা, তার পরদিন পেটের অসুখ, এই রকমে তাঁহার অর্দ্ধেক দিন আহার বন্ধ হইয়া গেল। শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল, পিতামহীর মৃত্যু হইল। তাহাতে প্রফুল্লের প্রাণে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা অবর্ণনীয়।

মনের কষ্টেই হউক, কিম্বা এক মাস অশৌচ পালনের জন্যই হউক, এই সময়ে প্রফুল্লের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রফুল্লের চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে পীড়ার হেতু অন্তরে, বাহিরে তাহার ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি ফল দর্শিবে?

চিকিৎসকগণ রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন "অম্বল", কেহ বলিলেন "ডিস্পেপ্সিয়া", আবার কেহ বা অন্য রোগের না[illegible]লেন।

যাই হউক রোগের উপশম করিতে কেহই সক্ষম হইলেন না। অবশেষে চিকিৎসকগণের চিরপ্রথামত সকলে একমত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

আনন্দ বাবুও তাহা যুক্তিসঙ্গত খুলিয়া মনে করিলেন। আনন্দ বাবু গোড়া কাটিয়া আগায় বিস্তর জল ঢালিতে লাগিলেন। দরিদ্রকন্যা রমাকে উপেক্ষা করিয়া, প্রফুল্লকুমারের চিরপোষিত আশালতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে বৃথা ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু বড় আগ্রহে "বড় কুটুম্ব" করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি যে স্বয়ং বৃক্ষমূল রোপণ করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। চিকিৎসকগণ যখন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তখন আনন্দ বাবুর চিন্তার পরিসীমা রহিল না। তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনুপমা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তাহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হইল। অনুপমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করাতে প্রফুল্ল বাস্তবিক কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন, কারণ অনুপমার ব্যবহারে প্রফুল্ল মর্ম্মে মর্ম্মে যন্ত্রণা পাইতেন। গর্ব্বিতা অনুপমা সদ্ব্যবহার দ্বারা পীড়িত স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন করা দূরে থাক, সর্ব্বদাই স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিত।

ধীরপ্রকৃতি প্রফুল্লকুমার পিতা মাতাকে এ সকল কিছু জানিতে দিতেন না। তিনি হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে গোপনে রাখিতেন।

তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ বিজয় তখন তাঁহার নিকটে ছিল না। বিজয় চাকুরী গ্রহণ করিয়া সুদূর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা খুলিয়া বলিবার লোক আর কেহ ছিল না।

হৃদয়ের বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া তিনি নীরবে দিনপাত করিতেন।

এলাহাবাদের ষ্টেসন মাষ্টার আনন্দ বাবুর স্বদেশবাসী এবং বাল্যবন্ধু। বিদেশে একজন পরিচিত লোক থাকিলে সুবিধা হইবে ভাবিয়া আনন্দ বাবু এলাহাবাদে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করিলেন।

কলিকাতার বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে স্ত্রী সুকুমারী এবং পুত্র প্রফুল্লকুমার, আর একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দুইজন ভৃত্য লইয়া এলাহাবাদে রহনা হইলেন। ষ্টেসন মাষ্টার নিত্যানন্দ বাবুকে বাসার জন্য পূর্ব্বেই পত্র লেখা হইয়াছিল। ট্রেণ যথাসময়ে এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিলে নিত্যানন্দ বাবু স্বয়ং অভ্যর্থনা করিয়া আনন্দ বাবুকে সপরিবারে নিজের বাসায় সমাদরে লইয়া গেলেন। তিনি আনন্দ বাবুর নিমিত্ত গঙ্গার ধারে একটী অতি সুন্দর বাসাবাটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন সে

বাসায় তাঁহাদের যাওয়া হইল না। আনন্দ বাবু বাল্য-বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, সে দিন সপরিবারে নিত্যানন্দ বাবুর বাসাতেই রহিলেন। পথশ্রমে প্রফুল্ল বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বাবু অতি যত্ন সহকারে প্রফুল্লকুমারকে অন্দরমধ্যে লইয়া গেলেন। প্রফুল্ল ক্লান্ত দেহ লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িলেন। তাঁহার বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল বলিয়া তিনি কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী প্রফুল্লের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ বাবুর আলয়ে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন আর কোন আত্মীয় ছিল না। নিত্যানন্দ বাবু তাঁহার ভৃত্যকে প্রফুল্লের জন্য গরম দুধ আনিবার আদেশ করিয়া আনন্দ বাবুর সঙ্গে প্রফুল্ল যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুকুমারী ঈষৎ অবগুণ্ঠন দিয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিলেন। প্রফুল্লকুমার চক্ষু নিমীলিত করিয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার নিমিত্ত দুধ লইয়া নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী স্বয়ং আসিতেছিলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে আনন্দ বাবু ও নিত্যানন্দ বাবু থাকায় তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন না। দ্বারের পার্শ্বে তাঁহার মলের শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ শুনিয়া নিত্যানন্দ বাবু ডাকিলেন "এস, ভিতরে এস?" হাতে দুধের বাটী, বালিকা একপদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। নিত্যানন্দ বাবু আবার ডাকিলেন "এস না, ভিতরে এস না, তোমার এত লজ্জা কেন রমা! আচ্ছা আমি যাচ্চি, তুমি দুধটা প্রফুল্লকে দিয়ে যাও।" এই বলিয়া নিত্যানন্দ বাবু আনন্দ বাবুর সঙ্গে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। 'রমা' নাম শুনিয়া প্রফুল্ল চকিতের ন্যায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হায়! এ নাম যে প্রফুল্লের হৃদয়ের পত্রে পত্রে লেখা রহিয়াছে! এ নাম তিনি কি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন? আজ পাঁচ বৎসর এ নাম প্রফুল্ল কাহারও মুখে শুনেন নাই। নিত্যানন্দ বাবুর স্ত্রী দুধ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঈষৎ অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে রমাও এক বার প্রফুল্লকে দেখিয়া লইলেন। প্রফুল্ল অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু দুটী দেখিয়া প্রফুল্ল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "রমা? রমা তুমি এখানে? তুমি এই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পরিণীতা স্ত্রী? কি দারুণ অত্যাচার! হায়! প্রফুল্ল আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। একে দুর্ব্বল শরীর, তাহার উপর এই অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা হেতু যখন প্রফুল্ল কুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তাঁহার পীড়া অতি শঙ্কট-

জনক হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল বটে, কিন্তু উত্থান-শক্তি আর রহিল না।

তাঁহার জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল। স্থানীয় চিকিৎসকেরা অনেক যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তাঁহারা প্রফুল্লের জীবন সম্বন্ধে এক প্রকার হতাশ হইলেন। তখন আনন্দ বাবু নিজকৃত কর্ম্মের ফল বুঝিতে পারিলেন। বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে সুকুমারীরও অনুতাপের সীমা রহিল না। রমার রূপ, রমার সরলতা, রমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন "হায়? ইচ্ছা করিলেই এই দেবীতুল্য বালিকাকে আমার কুললক্ষ্মী করিতে পারিতাম। নিজের দোষে নিজে এই স্বর্ণপ্রতিমা হারাইয়াছি। আমাদেরি দোষে আমাদের একমাত্র পুত্র এই দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে।"

তাঁহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এই দেবীপ্রতিমা লাভে বঞ্চিত হইয়াই প্রফুল্লের আজি এই দশা!

কিন্তু তখন বুঝিলে আর কি ফল? মানুষ এত অল্পবুদ্ধি যে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কোন কায করিতে পারে না, বর্ত্তমানই মানুষ বোঝে ভাল। শেষে অনুতাপের বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকে। আনন্দ বাবু ও সুকুমারীরও তাহাই হইল। এখন তাঁহারা বুঝিলেন অর্থ ক্ষণস্থায়ী, শান্তিই মানুষের জীবনের প্রধান বাঞ্ছনীয়!

এখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যদি প্রফুল্লকুমারের জীবন রক্ষা না হয়, তবে এ অগাধ সম্পত্তি লইয়া কি হইবে? এখন আনন্দ বাবু স্বীয় মস্তকে করাঘাত করিয়া নিজের বুদ্ধিকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এখন কথা এই যে, রমা আবার কি প্রকারে প্রফুল্লের অদৃষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল? তাহা জানিবার জন্য যদি পাঠিকা ভগ্নীদিগের কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে শুনিয়া যান!

পিতার পত্র পাইয়া প্রফুল্লকুমার তো রমার আশা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। আনন্দ বাবুও নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এ দিকে রমার মাতা কন্যা লইয়া মহা-বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সংসারে যাহার অর্থ নাই, তাহার কিছুই নাই, অর্থ না থাকিলে আজকালকার বাজারে কি মেয়ের বিবাহ হয়? রমার মাতা যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন আর কে বুঝিবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিত্যানন্দ বাবুর বাড়ী গৌরীপুরে। রমার মাতা যখন কন্যা লইয়া বিব্রত, সেই সময় নিত্যানন্দ বাবু কোন কার্য্য উপলক্ষে বাটীতে আসিয়া-

ছিলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি রমার কথা শুনিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টের ফলে তাঁহার দুই স্ত্রীই কয়েকটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। বিপত্নীক নিত্যানন্দ বাবু রমার রূপলাবণ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন।

তিনি রমার মাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিলে পর রমার মাতা অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন।

সম্মত না হইয়া তিনি কি করেন? তিনি বুঝিলেন অর্থব্যয় করিতে না পারিলে মনের মত পাত্র মিলিবে না। অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে মেয়ে বড় হইয়াছে, বিয়ে না দিলেই নয়? লোকে নিন্দা করিতেছে। তিনি অনাহার বিধবা, কি করিবেন? কাযেই তাঁহাকে নিত্যানন্দ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পক্ষের পাত্রের হস্তে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা অলোকসামান্য-রূপবতী কন্যাকে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন, সমাজের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের পাত্র, দ্বাদশ-বর্ষীয়া পাত্রী, কি সুন্দর মিলন! নিত্যানন্দ বাবু বিবাহ করিয়া, রমাকে লইয়া স্বীয় কর্ম্মস্থান এলাহাবাদে প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধ নবপত্নী লইয়া শুষ্কহৃদয়ে নূতন প্রণয় স্থাপন করিয়া ঘর করিতে লাগিলেন।

ঘটনাচক্রে কিছুদিন পরে প্রফুল্ল-কুমারও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৭)

প্রফুল্লকুমারের পীড়া যখন বড় বাড়াবাড়ি—শোচনীয় অবস্থা, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন আনন্দ বাবুর বাসায় বিজয় আসিয়া দেখা দিলেন। বিদেশে রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া বন্ধুহীন স্থানে বিজয়ের মত বন্ধুকে পাইয়া প্রফুল্ল যেন মৃত দেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহার সেই রক্তহীন শুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্তে বহুদিবস পরে আজি হাসি দেখা দিল।

আনন্দ বাবু ও সুকুমারীর মুখে বিজয় সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া প্রফুল্লের শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। প্রফুল্লের হাত দুইখানি ধরিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "ভাই! তুমি হিন্দুসন্তান! হিন্দুর পিতামাতা অপেক্ষা গুরু আর কেহ নাই! হিন্দুশাস্ত্রে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ রামচন্দ্র পিতার সত্য পালনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে মাতার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তুমিও সেই হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভাই! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই প্রকার গরিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করা

পরম শ্লাঘনীয় মনে করিয়া থাকি। তুমি হিন্দুসন্তানের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ, পিতার আজ্ঞাক্রমে বিবাহ করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। তবে আর বৃথা কেন ভাই পরস্ত্রীর চিন্তা করিয়া নিজের শরীর মাটী করিতেছ ও পিতা মাতার মনে কষ্ট দিতেছ? বিবাহ করিয়াছ, নিজের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি ভাল বাসা অর্পণ কর, হৃদয়ে সুখশান্তি আনয়ন কর।" প্রফুল্ল একটু ম্লান হাসি হাসিলেন, বলিলেন "ভাই সুখশান্তি আমার এ জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে। জানি না, বাবা কেন আমার বিবাহ দিয়াছিলেন? যত দিন বিবাহ করি নাই, তত দিন বেশ ছিলাম। ঠাকুরমার কাছে উপকথা শুনিয়া তখন কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি! চাঁদের আলো দেখে, পাখীর গান শুনে, কত সুখ পেতাম। তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে বেড়াইয়া গল্প করিয়া কত শান্তি পেতাম। কিন্তু সে দিন আর নাই বিজয়! সে দিন আর ফিরিবে না। এখন এ জীবন গেলেই মঙ্গল?"

প্রফুল্লের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া বিজয় বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন "তুমি এমন কথা বল্‌তে পার না প্রফুল্ল! ছিঃ পিতার একমাত্র সন্তান তুমি, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! পিতা মাতার নয়নমণি, এ কথা বলা তোমার শোভা পায় না। সামান্য এক নারীর চিন্তায় দেখ্‌ছি তুমি পিতৃভক্তি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছ"।

প্রফুল্ল বিজয়ের এই মৃদু ভৎর্সনা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "না বিজয়! আমি পিতৃভক্তি বিস্মৃত হই নাই। আমার এ দেহে যতক্ষণ জীবন থাকিবে, পিতা আমার কাছে ততক্ষণ ঈশ্বর স্বরূপ থাকিবেন। বোধ হয় জগদীশ্বরের চেয়ে আমার পিতা আমার কাছে অধিক বরেণ্য। আমার প্রাণ থাকিতে আমি কখনো পিতার মনে কষ্ট দিব না। আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই রমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু পিতার অনভিমতে কোন কার্য্য করিব না বলিয়াই আমি সে কায করি নাই। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে রমার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এ জীবনে তাহা মুছিবার নহে, আমি পিতার আজ্ঞা বলিয়াই কেবল রমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম।

বিজয়। তুমি বিবাহিত, তোমার ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অন্য রমণীর চিন্তা করাও তোমার মহাপাপ। তোমার সেই ধর্ম্মপত্নীকে ভাল বাসিবার চেষ্টা কর।

প্রফুল্ল। ধর্ম্মপত্নীর কথা কি বলিতেছ ভাই? আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সে কথা বলিয়াছি। বাবা যদি আমার বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে আমি বেশ থাকিতাম। পিতামাতার চরণে এ জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া হাসিতে হাসিতে এ জীবন কাটাইতে পারিতাম। কিন্তু অনুপমাকে

বিবাহ করাই আমার কাল হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছি, ধর্ম্মের অনুরোধে অনুপমাকে ভাল বাসিব, কিন্তু তাহা হইবার নয়, বিজয়! অনুপমার স্নেহপূর্ণ কথা, তাহার তীব্র তিরস্কার, মর্ম্মভেদী ভৎর্সনা, সর্ব্বদাই আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত করে। অনুপমা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। তাই বলি, বিজয়! আমার এ জীবন গেলেই মঙ্গল।"

বিজয় শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ও কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন "ভাই! এ সংসারে এই নিয়ম। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহাকে পায় না! মানুষ যাহা চায়, তাহা পায় না। এ সংসারে কার কত বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, প্রফুল্ল? রমার স্মৃতি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, কর্ত্তব্যের পথে চলিতে আরম্ভ কর, তা হলেই প্রাণে শান্তি আসিবে। কর্ত্তব্য পালন রোগ, শোক, দুঃখ সব নিবারণ করিবে।"

প্রফুল্ল আবার মৃদু হাসিলেন। বলিলেন "ভাই! রমাকে আমি বড় ভালবাসি, কিন্তু এ ভালবাসায় লালসা নাই। আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসি, তাহার নির্ম্মল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করি, তার সরলতাকে ভক্তি করি, তার কোমলতাকে স্নেহ করি। তার দেহ লইয়া ক্রীড়া করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই! মানুষের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও সমাজের উৎপীড়ন দেখিয়া আমি বড় মর্ম্মাহত হইতেছি।

দেখ ভাই! অর্থ ভিন্ন মানুষ আর কিছুই চায় না? রমার মত রূপগুণ-যুক্ত লোক-ললামভূত বালিকার দরিদ্রের কন্যা বলিয়া বিবাহ হইল না। তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার বংশমর্য্যাদা কিছুতেই মানুষকে বশীভূত করিতে পারিল না। অর্থ নাই বলিয়া কোন ভদ্রসন্তান তাহাকে বিবাহ করিল না। অবশেষে পঞ্চাশবর্ষীয় একজন বৃদ্ধ এই অপূর্ব্ব-সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিল। বৃদ্ধ আর কতদিন এ সংসারে জীবিত থাকিবে। পরে বালিকার দশা কি হইবে? শুধু রমা বলিয়া নহে, আমাদের সমাজমধ্যে প্রতিনিয়তই এই প্রকার ঘটিতেছে। এই জন্যই হিন্দুসংসারে বাল্য-বৈধব্য, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানা-বিধ পাপস্রোত বহিয়া যাইতেছে। তবুও মানুষ বুঝে না? তবুও বাঙ্গালীর চক্ষু-রুন্মীলন হয় না।

বিধবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে এই সংসার পরি-পূর্ণ! এই সব পাপের ফলেই আমাদের বাঙালী জাতি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই জন্যই বাঙালীর গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে সকলে কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ দরিদ্রের গৃহে এইরূপ।

বিধাতার রাজ্যে কেন এত অবিচার হয়, ভাই! ইচ্ছা হয় সমাজকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গঠন করি, কিন্তু হায়! একা দুর্ব্বল আমি কি করিতে পারি?"

বিজয় বলিলেন "বেশ বলিয়াছ

প্রফুল্ল! এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করাই মানুষের কর্ত্তব্য। উঠ, হৃদয়ে শক্তি আনয়ন কর, সংসারের কার্য্যে আত্ম নিয়োগ কর, সমাজের উন্নতিকল্পে জীবন পণ কর। অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। রোগশয্যায় শুইয়া চিন্তা করা রমণীর কার্য্য, পুরুষের নহে।"

বিজয় বন্ধুর হিতার্থে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে উপদেশ দিতেন।

বিজয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া ও সর্ব্বদা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া প্রফুল্ল অনেকটা শান্তিলাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও সুস্থ হইতে লাগিল।

হতাশ প্রেমকে পরাজিত করিয়া বিশ্ব-প্রেমে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে আনন্দ বাবু তাঁহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল প্রাণপণে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন হয়, তাহারি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রফুল্ল এই বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। স্বয়ং প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিলেন। অর্থোপার্জ্জন করিয়া দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়িতের শুশ্রূষা, পরের উপকার, তিনি যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়কে তিনি আর কখনও কাছ ছাড়া হইতে দিলেন না। বিজয় তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ, হৃদয়ে বল, কর্ম্মে সাহস। বিজয় তাঁহার সর্ব্বস্ব। বিজয়কে তিনি এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে সব অন্ধকার দেখিতেন। বিজয় তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ের জ্যোতি, ধর্ম্ম-পথের সহায়।

অনুপমা অধিকাংশ কাল তাঁহার পিত্রালয়েই অবস্থান করিত, কখন কখন আনন্দ বাবুর বাটীতে আসিত। প্রফুল্লের সহিত মনের মিল তাহার কখনও হইল না। তাহার গর্ব্বিত স্বভাবটীরও কখনও পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার ব্যবহারে শ্বশুর ও শ্বশ্রূ, কেহ কখনও সুখী হইতে পারিলেন না। চিরদিন তার স্বভাব সমভাবেই রহিল।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(তাঁহার লিখিত ডায়েরী)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্র।

লাহোর।

২রা নবেম্বর ১৮৭৩

প্রিয় উমেশচন্দ্র,

ছুটীতে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তুমি যে চেষ্টা করিয়াছ, তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

এইরূপ চেষ্টা আমার পক্ষে বিশেষ সন্তোষের কারণ। যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা তো দেশ বিদেশে ব্রহ্মনাম প্রচার করিবেনই। কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে ধর্ম্মোৎসাহী ও প্রেমিক ব্রাহ্মমাত্রেই সময়ে সময়ে সত্যরাজ্য বিস্তারের জন্য যত্ন প্রকাশ করেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম কি প্রচারক নহেন? অমৃত পান করিলেই পান করাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা স্বাভাবিক শাস্ত্র, কে ইহা অস্বীকার করিবেন? বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহী হইলে আমি কৃতার্থ হই। এমন সুধামাখা দয়াল নাম যতই ঘরে ঘরে বিলাইবে, ততই আমার প্রাণ তোমরা ক্রয় করিয়া লইবে।

আমি অনেক দিন হইতে বলিতেছি যে, স্ত্রী-বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এত টাকা ব্যয় হইতেছে, কিন্তু ফল তদ্রূপ হইতেছে না। মেয়েগুলি ধর্ম্মেতে, জ্ঞানেতে, যথার্থ উন্নতি লাভ করেন এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া ভালবাসি। কেবল কতকগুলি অসার কথা শিখাইয়া তাঁহাদিগকে বিকৃত করিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত জ্ঞান দিতে না পারিলে আমার মনে বড় কষ্ট হইবে। এ বিদ্যালয়টী যেন অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত না হয়। তোমাদের নিকট আমি এই প্রার্থনা করি এবং আশাও করি। একটী মণ্ডলীকে যথার্থ মানুষ করিয়া দিতে হইবে। আর দুই মাস দেখা যাক্, এই দুই মাস খুব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্যালয়টী ভাল হয় এবং আমার মেয়েগুলি সুখী হয়? সে বিষয়ে তোমরা কি করিতে পার আমাকে লিখিলে আমি মতামত প্রকাশ করিতে পারি। আপাততঃ তোমার ইচ্ছানুসারে একটী তালিকা পাঠাইতেছি, তদনুসারে নিয়মিত বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইবে। জানুয়ারী মাসে ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা হইবে। এখানকার সংবাদ মঙ্গল। তোমার পরিবারকে এবং আশ্রমবাসী আর আর সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে। মিস্ কলেট্ বামাহিতৈষিণী সভা সম্বন্ধে রাধারাণীর নামে আমার নিকট এক উৎকৃষ্ট পত্র পাঠাইয়াছেন। আমি উহা পরে পাঠাইব। উহার উত্তর দিতে হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

PURNIA B S.

১৮ই জুন রবিবার প্রাতে।

ধর্ম্মবিষয়ে অচৈতন্য সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, কেননা তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি ঔদাসীন্য।

এই ঔদাসীন্য দ্বারা এক দিকে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হওয়া, অন্য দিকে অসার মোহে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে প্রতারিত হওয়া। প্রাচীন কালের ঋষিগণের এবং বর্ত্তমান কালের সভ্যতাভিমানীদিগের জ্ঞানের এই তারতম্য।

আমাদিগের শরীরের চক্ষু দ্বারা যাহা

দর্শন করি, তাহা অসার বিষয় দর্শন—পশু-জীবনের ভাব, মৃত্যু। এই চক্ষুর অতীত যে চক্ষু আছে, তাহা না খুলিলে সার জীবনের পথ দেখিতে পাই না। অদৃশ্য আশ্চর্য্য জগতের সকল ব্যাপার সেই চক্ষুর গোচর।

(১) এই চক্ষু কত লোকের খুলে নাই। কত লোকের খুলিয়া পুনরায় নিদ্রিত।

(২) কত লোকের খুলিয়াছে বলিয়া বোধ আছে, কিন্তু বস্তুতঃ নিদ্রিত।

ধর্ম্মরাজ্যে জাগ্রত হওয়া প্রথম কথা, পরে দেখা, চলা, সুখাস্বাদন করা। ঈশ্বর এই জন্য জিজ্ঞাসেন এখনও নিদ্রিত? উৎসবের বিশেষ ঘটনা প্রেরণ ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য।

৮ই জুন রবিবার রাত্রি।

ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও।

১। মানুষের এক অংশ পৃথিবীর, তাহা নশ্বর—কিন্তু আর এক অংশ অবর—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। তাহাই যথার্থ মনুষ্যের প্রকৃতি।

২। ঈশ্বর পূর্ণস্বভাব—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পুণ্যে মানব প্রকৃতির আদর্শ।

৩। মানবপ্রকৃতি কুসুমের ন্যায় বিকসিত হইবে—জ্ঞান, প্রীতি, ন্যায় ও পবিত্রতায়।

৪। উন্নতি একদিকে সমঞ্জস, অন্য দিকে অসীম।

৫। চক্ষু ক্ষুদ্র হইলেও অসীম আকাশ দেখিতে চায়, ক্ষুদ্র সীমাতে পীড়িত হয়। আত্মা ক্ষুদ্র হইলেও অনন্ত আদর্শ চায়, সীমাবদ্ধ আদর্শে পীড়িত হয়।

৬। আত্মার ভাবের উন্নতি মনুষ্য অনেক করিয়াছে, কিন্তু "এই পর্য্যন্ত" কেহ বলিতে পারে না।

ব্যবধান মনুষ্যের আত্মার বিষম শত্রু। মুক্তির অর্থ অমৃতভাব, বদ্ধভাব নহে।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য-প্রকৃতির পূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৯ই জুন সোমবার প্রাতে।

প্রীতি পরম সাধন।

১। প্রকৃত ধর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রীতি।

২। প্রীতি জ্ঞান ও কার্য্যের প্রাণ ও উন্নতির সাধক।

৩। ঈশ্বর আমাদিগের প্রীতির পাত্র অনেক বার।

(১) তাঁহার ন্যায় সুন্দর পদার্থ কে?

(২) তাঁহার ন্যায় ভালবাসে কে?

(৩) তাঁহার সঙ্গে প্রীতির অনন্ত ফল।

৪। এই প্রীতি জন্মিয়াছে কিনা লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হয়—

(১) বিচ্ছেদে ক্লেশ। (২) মিলনে সুখ এবং নিকটস্থ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা। (৩) প্রিয়ের প্রিয় কার্য্য অকাতরে অনুষ্ঠান, স্বার্থ-বিস্মৃত হইয়া।

৫। ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের ভাব ও কার্য্য।

৬। ঈশ্বর অপ্রেমের প্রতিবন্ধক।

৭। অপ্রেমিকও প্রেমিক হইবে ব্রহ্মকৃপাতে।

"উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রান্তরে॥"

৯ই জুন সোমবার রাত্রি।

১। ধর্ম্মপথ কঠিন না সহজ?

২। কঠিন হইলেও একমাত্র যে পথে পরম ধনলাভ হয়, তাহা কি পরিত্যাগ করা যায়?

৩। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।

৪। ধর্ম্মের কঠিনত্বের কারণ ইহার প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত পরীক্ষা, বাহ্য ও আন্তরিক।

৫। সংসার-লক্ষ্য ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কঠিন, কারণ তাহারা ত্যাগ স্বীকার ও ক্লেশ বহনে ভয় করে।

৬। প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর নিকট ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট বহন অতি তুচ্ছ, এই জন্য ধর্ম্মপথ সহজ।

৭। সাধনের প্রথম অবস্থা অতিক্রম করিলে অনুকূল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। প্রথমতঃ সাধকের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া বীরবেশে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দক্ষিণে ও বামে না হেলিয়া অগ্রসর হইতে হয়।

৯। পর্ব্বতারোহণের ন্যায় ধর্ম্মপথারোহণের যত শেষ তত মনোরম, শেষ প্রান্ত অনির্ব্বচনীয়।

১০ই জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকাল।

ধর্ম্ম মনে নয়, ভাবে নয়, কার্য্যে নয়, কিন্তু বিশ্বাসে।

২। বিশ্বাস স্বর্গীয় বস্তু, ইহার এক কণার অদ্ভুত ক্ষমতা পার্থিব সমুদায় বস্তুকে চূর্ণ করে, এক কণা বিশ্বাসকে কেহ চূর্ণ করিতে পারে না।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে বিশ্বাস দ্বারা সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কিরূপে হইয়াছে? সামান্য লোকের বিশ্বাসে, একব্যক্তির প্রাণ বিসর্জ্জনে সহস্র প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে।

৪। বিশ্বাসের আলোককে যে রক্ষা করে, সে আরও অধিক প্রাপ্ত হয়। যে লুক্কায়িত করে, সে হারায়।

৫। সত্য প্রচার জীবন দ্বারা করিতেই হইবে।

লোকের প্রতিকূলতা তাহার পরীক্ষার জন্য, পরে লোকে চিনিয়া তাহাকে আদরে লইবে। যাহাতে অপ্রেমে বধ করে, তাহাতে দেবতা করে।

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কখন বলিব? যখন এরূপ বিশ্বাসে অবনতিশীল, দুর্গত জীবের সদ্গতি হইবে।

(ক্রমশঃ)

মনীষা।

সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে,

চায়ের শূন্য পাত্রটী নামাইয়া রাখিয়া নবীন মুন্সেফ মহেন্দ্র বাবু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাযটা ভাল হচ্ছে না মনীষা, তোমায় বল্লে তুমি গ্রাহ্য কর না, কিন্তু"—

হাস্যোৎফুল্ল মুখে মনীষা বলিল "কিন্তু আমার জন্য চারি দিকের চিন্তাশীল লোকেদের ভারি দুর্ভাবনা জুটেছে,—না? আচ্ছা, তুমিত হাকিম, একটা নোটিশ বার করে দাও—নির্ভয়!"

"না না দেখ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তুমি, গৃহস্থ ঘরের চালে থাক, কোন আপত্তি নাই"—

স্বামীর অসমাপ্ত কথার উত্তরে মনীষা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "বা! আমি কি পথস্থ ঘরের মেয়ের মত চালে আছি?"—

বিদ্রূপে বিচলিত হইয়া মহেন্দ্র নাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন "নয় কেন? সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, পাড়ায় পাড়ায় যত ছোট লোকদের ঘরে ঘরে বেড়ান, এ গুলো বুঝি বড় ভাল কায? লোকে ভারি সুখ্যাতি করে,—না?

মনীষা দুর্লক্ষণ দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিল, বিনীত ভাবে বলিল "সকালে আমি বেরুই না।"

"না হোক, সন্ধ্যার পর বেরোও তো? লোকে বল্‌তে ছাড়বে কেন? লজ্জায় আমার মাথা হেট হয় জান? যে আসে, সেই বলে মশাই আপনার স্ত্রী—"

"থাম থাম, তোমার গোটাকতক লক্ষ্মী-ছাড়া উকীল বন্ধু জুটে খোসামোদের তোড়ে তোমার মাথা খারাপ করে দিচ্চে তা আমি জানি, আমি বড় লোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতেও যাই না, আর গেরস্ত বাড়ীতে গল্প কর্ত্তেও যাই না, দু-দশ জন অনাথ গরীবের খবর নিলে কি এত গুরুতর অপরাধ হয় বলত—যে সবাই মিলে অত বিজ্ঞতা ফলিয়ে বাধা দিতে আসেন? সাধে বলি যত অকেযো লোকের আরাম শুধু পরচর্চ্চা চিবিয়ে।—"

মনীষা দুর্দ্দাড় করিয়া টেবিলের জিনিস গুলা নাবাইয়া, ঝাড়নে করিয়া সপাসপ্ টেবিল ঢাকা ঝাড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র নাথ গোঁপে মোচড় দিয়া মিনিট দুই ভাবিলেন, মনীষা সম্বন্ধে বাহির হইতে সংগৃহীত কতকগুলো জবানবন্দ,—মায় টীকা, অবয়, ব্যাখ্যা সহ যথেষ্ট ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন, পরে বলিলেন "দেখ পয়সার দ্বারা যতটা পার তুমি গরীব দুঃখীর উপকার কর,—কিন্তু নিজে অমন টো টো করে যেখানে সেখানে ঘুরো না—"

"বাঃ বেশতঃ, তোমার রোজকারের টাকাগুলো ঘুস দিয়ে আমি আরামে বসে

পুলি কিন্‌বো ? চমৎকার মীমাংসা তো'! —মনীষা আবার হাসিয়া ফেলিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল "দেখ, আমার এই সব ছোট কাযের এত বেশী খোঁজ খবর নিয়ে তোমার কাছে হিতৈষীপণা যাঁরা ফলাতে আসেন, তাঁরা যে কি রকম নির্লজ্জ আমি শুধু তাই ভাবি!—"

নিজের পক্ষটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ পুনশ্চ নবোদ্যমে অন্য দিক দিয়া তর্ক আরম্ভ করিলেন, মনীষার ও জেদ্ চড়িল। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটি করিয়া শেষে মনীষা অত্যন্ত রাগিয়া শপথ করিয়া বলিল "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎসন্ন যাইলেও যদি আর কোন দিন এই ঘরের কোণটা ছাড়িয়া বাহির হই, তা হলে……।"

মহেন্দ্রনাথ ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন দীনে, দীনে—"

কিশোর ভৃত্য দীনুয়া তখন বাহিরের প্রাঙ্গণে একটা কাগজের পাকান বল ও একটা দেবদারু কাঠের সরু তক্তাভাঙা লইয়া সাহেবদের টেনিস্ খেলার অনুকরণে লোফালুফি করিতেছিল, সহসা প্রভুর আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। মহেন্দ্র নাথ তীব্র স্বরে বলিলেন "ব্যাটা ফের যদি তোমার মাইজীকে নিয়ে কোথাও গেছ শুনি, তা হলে…।"

প্রভুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া দীনুয়া বুঝিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর লাঠী ও লণ্ঠন লইয়া মাইজীর সহিত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে যাওয়ায় একটা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে!—সে ভয়ে ভয়ে এক বার আড় চোখে মনীষার পানে চাহিল, কিন্তু মনীষা তখন তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া টেবিলের ফুলদানীতে কতকগুলা সপল্লব ফুটন্ত হাস্নুহানা সাজাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। দীনু কর্ত্রীর নিকট কোন আদেশ ইঙ্গিত না পাইয়া, অগত্যা প্রভুর বাক্যের উত্তরে নিঃশব্দে মাথা নোয়াইয়া বাহিরে আসিল। ইঃ! আজ সে কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছিল যে, অকারণ মনীষের কাছে ধমক খাইল?—

যাহাকে দশ কথা শুনান যায়, সে যদি দুকথা না জবাব দেয়, তাহা হইলে তাহা যেন বাতাসের সহিত মল্লযুদ্ধের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ হাস্য বিদ্রূপের ধারে মনীষা স্বামীর কথা কাটিতেছিল, ততক্ষণ স্বামী খুব নির্ভাবনা-তেই কথা চালাইতেছিলেন। কিন্তু শেষটা নিজের অত্যধিক রূঢ়তার দোষে প্রতিপক্ষের অবস্থান্তর ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার কেমন দুঃসহ অস্বস্তি বোধ হইল। কিন্তু তখন হঠাৎ থামিয়া গেলে নিতান্তই পরাজয়ের মূঢ়তা স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া মহেন্দ্রনাথ খুব জোরের সহিত আপনাকে ঠিক রাখিয়া নিঃশব্দে কার্য্যে রত স্ত্রীকে আরও গোটা-কতক শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া, সশব্দে দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ।

কুকুরের কামড়ান। (যেও কুকুর ও শেয়ালের জন্য—গৃহপালিতের জন্য নহে) সাদা অপরাজিতার বীজ ১টা ও ৩টা গোল মরিচ বাটিয়া (বার বৎসরের কম বয়সের অর্দ্ধ মাত্রা) তিন দিন প্রাতঃকালে সেবনীয়।

২। দুই দিন অন্তর পালা জ্বর—নাটার বীজ ও পিপুল (১ তোলা করিয়া) ও বাবলা পাতা (অর্দ্ধ তোলা) জলে বাটিয়া, ভিজে ছোলার মত বটি করিয়া দিনে তিন বার (বালকের অর্দ্ধ মাত্রা) বিজয়ের দিন সেব্য। পথ্য একটু দুগ্ধ। আরোগ্য হইলে ১টা করিয়া গুলি ২।৩ দিন ধরিয়া দিবে।

৩। গ্রহণী, রক্তামাশায়, শ্বেতামাশায় ও ডায়ারিয়ায়—এক ছটাক জাঙ্গী হরিতকী, অর্দ্ধ ছটাক আমলকী ফাটখোলায় ভাজিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিবে। পরে গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া (স্নানান দেওয়ার পর) কাশীর চিনি ১৯০ ছটাক মিশ্রিত করিবে। ৷৵০ ওজন পূর্ণ মাত্রা (দিনে দুই বার)। পথ্য জলমিশ্রিত বা খাঁটি দুগ্ধ।

৪। পৃষ্ঠব্রণ।—জল না ছুঁয়ে কাঠানোটের শিকড় তুলিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ঘায়ের মুখে গুঁজে দিলে পুঁয টানিয়া বাহির করে। কাঁটানটের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে সকল ফোড়াই ফাটিয়া যায়। অস্ত্র করিতে হয় না।

৫। দাঁতের পোকার যন্ত্রণা—রোগী চিকিৎসক দুজনেই জল না ছুঁয়ে আফুলা আপাংএর শিকড় তুলিয়া কাপড়ে পুঁছিয়া দাঁতে ছপটির মত মারা। উহাতেই সারিবে।

৬। ঘুংড়ি কাশি। (১) এক ঝিনুক দ্রাক্ষী শাকের রস উষ্ণ করিয়া, কিম্বা ইষেণমূলের রস এক ঝিনুক খাওয়াইলে এক দিন বা দুই দিনেই সারিবে।

বালকের আদার রস ও মধু, দিনে ৪।৫ বার।

৭। সাধারণ কাশি। এক তোলা আদার টুকরা ও এক তোলা মিছরি, দিনে ৫।৬ বার। তিন দিন স্নান বন্ধ।

৮। দু আনা শুঁটের গুড়া এক ধান কর্পূর ও দুটা গোলমরিচ গুড়া, দিনে ৩।৬ বার। তিন দিবস স্নান বন্ধ।

৯। শুষ্ক কাশি। তালের মিছরি অনবরত মুখে রাখিবে, অথবা যষ্টিমধুচূর্ণ ও মিছরি চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া মুখে রাখিবে। স্নান করিবে। (উদ্ধৃত)

নূতন সংবাদ।

১। গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের অন্যতম লেখক

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের সময় "লুসিটেনিয়া" নামক জাহাজ ডুবি হইয়া কোন্ অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের পাঠিকারা অনেকেই ইন্দুপ্রকাশের রচনা পাঠ করিয়াছেন। তিনি একজন সুলেখক ও উৎসাহশীল যুবক। সংসারের শত বিঘ্ন বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সুদূর আমেরিকায় জ্ঞান উপার্জ্জনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস, সি উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে এই বিপদ সংঘটিত হয়। স্বদেশে ফিরিবার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে যে জাহাজে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে জাহাজ অপেক্ষা "লুসিটেনিয়াম" আসিলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দেশে ফিরিতে পারিবেন এই শুনিয়া পূর্ব্বের জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া ইহাতেই আরোহণ করেন। বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝিবে? বাড়ী আসিবার জন্য যে প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়াছিল, সে আর এ জীবনে যে ফিরিয়া আসিবে তাহা আশাতীত। ইন্দুবাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃদ্ধা জননী, তিনটী শিশু সন্তান, পত্নী ও আত্মীয় স্বজন এই নিদারুণ সংবাদে কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তিনি এই শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল।

গুণানুসারে।

প্রথম বিভাগ।

১। আইরিস্, ভি, এম, লি ব্রুণ্ড—লোরেটো হাউস
২। রায় সুশীলা—বেথুন
৩। সেন জ্যোৎস্নাময়ী—"
৪। আইরিন, ভারডন—নর্ম্মলেজিয়েট
৫। দত্ত সুধাময়ী—বেথুন
৬। মেবল জোহানস্—নর্ম্মলেজিয়েট
৭। লিলিয়ালুটরে— "
৮। জিজারাথানায় এটনী—ডাওসেসন
৯। দাসগুপ্ত স্বর্ণপ্রভা—বেথুন
১০। এডিল ষ্টিভেন্স—নর্ম্মলেজিয়েট
১১। অ্যানিব্রুণ—ডাওসেসন
১২। রায় মনীষা—বেথুন
১৩। ডোরিস মেকন্—নর্ম্মলেজিয়েট
১৪। দাস, লাবণ্য লতা— "
১৫। দ্বিজবালা—" "
১৬। ভট্টাচার্য্য উষা—লরেটো হাউস
১৭। কিংস্লি ক্যামেরিন—নর্ম্মলেজিয়েট
১৮। রায়, হর্টেনস্ মেরিয়েন্স—ডাওসেসন,
১৯। গারেট্ কনষ্ট্রান্স—নর্ম্মলেজিয়েট

২০। লিলিম্যান ডোরা—লোরেটো-হাউস
২১। কোর্টগার্ট্রুড—নর্মালেজিয়েট দ্বিতীয় বিভাগ।
২২। বরজেস্ লিজি—লরেটো হাউস
২৩। চৌধুরী প্রেমজা—বেথুন
২৪। ক্রু, ইউনিফ্রেড—লরেটো হাউস
২৫। দাস নলিনী বালা—বেথুন
২৬। ঘোষাল পূর্ণিমা— ”
২৭। গ্রেস্ রেনার—নর্মালেজিয়েট
২৮। লিয়ার ফ্লোরেন্স, এল,— ”
২৯। মণ্ডল, লীলাবতী— ”
৩০। নায়ক, নিশীথবালা—ডাওসেসন
৩১। পাণ্ডে, বসন্তকুমারী—বেথুন
৩২। রায়, শান্তশীলা—নর্মালেজিয়েট।
৩৩ হেমবালা—বেথুন
৩৪। সোম সুনীতিবালা—নর্মালেজিয়েট
৩৫। টারগেট বিট্রাইস— ” তৃতীয় বিভাগ।
৩৬। দাসগুপ্তা প্রভাবতী—”

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

পশ্চিম বাঙ্গালা।

আইরিস ব্রুণ্ড—২৫৲ লরেটো
সুশীলা রায়—২০৲ বেথুন
সুধাময়ী— ” ”
জিভারাথানায় এণ্টনী—ডাওসেসন
অ্যানি ক্রপ— ”

পূর্ব্ববাঙ্গালা।

জ্যোৎস্নাময়ী সেন—২৫৲ বেথুন
স্বর্ণপ্রভা দাস গুপ্তা—২৫৲ বেথুন

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল।

প্রথম বিভাগ।

১। ব্যানার্জ্জি—মাধবিকা, বেথুন
২। চিত্রলেখা, ব্রাহ্ম গার্লস
৩। ”—ডলি, ডাওসেসন
৪। বড়ুয়া—রাজবালা, বেথুন
৫। বসাক—ইন্দিরা, রাডেন্সগার্লস
৬। বসু—মুক্তি, ব্রাহ্ম গার্লস
৭। ভৌমিক—মালিকা ”
৮। বিশ্বাস—প্রীতিকণা, ছোট নাগপুর গার্লস
৯। চক্রবর্ত্তী—চারু লতা, বিদ্যাময়ী
১০। চট্টোপাধ্যায়—নিরুপমা, ঢাকা ইডেন
১১। দত্ত—রেণুকা, দার্জ্জিলিং মহারাণী স্কুল
১২। গাঙ্গুলী—জয়ন্তী, বেথুন
১৩। ঘোষ—বেলা, তুলাসার
১৪। ” —লীনা, ডেওসেসন
১৫। গুহ—নিহারবালা, চাটগাঁও বালিকা।
১৬। হালদার—সরল প্রভা, ডাওসেসন
১৭। মৈত্র—কমলা, ব্রাহ্ম গার্লস
১৮। মজুমদার—সুমতি, চট্টগ্রাম
১৯। মিত্র—শৈবলিনী ব্রাহ্মবালিকা
২০। নন্দী—বিমলা, বেথুন
২১। রাও—শকুন্তলা, ব্রাহ্ম গার্লস
২২। রায়—সুপ্রভা, বিদ্যাময়ী
২৩। নেজমা রসুল—লোরেটো হাউস

দ্বিতীয় বিভাগ।

আচার্য্য—সরোজিনী

২৪। বানার্জ্জি—অসীমা, ক্রাইষ্টচার্চ

২৫। বসু—সিরোজ নলিনী
বেলা অসেশ প্রবাল

২৬। ঘোষ—তরুলতা, প্রাইভেট

২৭। ”—সুপ্রভা, ডাওসেসন

২৮। গুহ—পুণ্যপ্রভা, প্রাইভেট

২৯। কোয়ার—লাছী বাই, ব্রাহ্ম-গার্লস

৩০। মুখার্জ্জি—নীহারযামিনী ক্রাইষ্ট চার্চ।

৩১। রায়—গিরীন্দ্রবালা, ডাওসেসন

৩২। ”—ক্ষান্তবালা, গার্ডিনার মেমোরিয়াল

৩৩। ”—ছোট নাগপুর

৩৪। সেন—শান্তিবালা, বেথুন

৩৫। সিংহ—প্রেমসুধা, ব্রাহ্মবালিকা

৩৬। সুকুল—জয়ন্তি, বেথুন

তৃতীয় বিভাগ।

৩৭। দে—মৃণালীনী, প্রাইভেট

৩৮। দত্ত—বিনোদিনী, বারাকপুর মিশন

৩৯। সিংহ—রমোলা, ব্রাহ্ম গার্লস

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রী।

বালিকাদের মধ্যে প্রথম

চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৲

দ্বিতীয়

কুসুম কুমারী সেন ১৫৲

শকুন্তলা রাও—১০৲

মাধবিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—১৫৲

নেজলা রসুল—১৫৲

বিমলা নন্দী— ”

নীহারবালা গুহ—২০৲

পূর্ব্ববঙ্গের বৃত্তি।

সুপ্রভা রায়—২০৲

নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় —”

চারুলতা চন্দ—„

রেণুকা দত্ত—„

মিনতিবালা আচার্য্য—”

কমলকুমারী মৈত্র ২০৲

মুক্তি বসু ১৫৲

বামারচনা।

বিপত্নীকের পত্নীমিলন।

শুন যত সভাজন বল হরি বোল
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়্‌ল হাসির রোল।
সত্তর বর্ষ বয়স হল গিন্নী গত তার,
বিয়ের তরে বুড়ো পাগল খোঁজে পরিবার।
গিন্নী গত, গৃহশূন্য, দুনিয়া অন্ধকার,
ভাবে বুড়ো কবে পাব, বনিতা আবার।
তিন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, আর
জামাতা দুহিতা দিয়ে পূর্ণিত আগার।
সে সকলে নাইক মন ভাবে নিশিদিন,

কোথায় পাব পত্নী হবে কবে শুভদিন।
তার পরেতে বিধির লীলা শুন চমৎকার,
বিজ্ঞাপনে নজর পড়ে একদিন বুড়ার।
সুদূর পল্লীতে এক কুলীন ব্রাহ্মণ
তাহার ঘরে আছে কন্যা কুমারী তিন জন;
পঞ্চাশ বছর বয়স, মেজটি তিরিশ,
কনিষ্ঠা যে কন্যা, তাহার বয়স হল বিশ।
অর্থাভাবে পিতা তাদের করেনিক দান,
কারুন বিয়ে, যদি কেহ শুধু কন্যা চান।
বিজ্ঞাপন দেখে বুড়ার নেচে উঠল প্রাণ,
এত দিনে বুঝি বরা করলেন ভগবান।
হারা নিধি পেলে লোকের যে আনন্দ হয়,
শুভ খবর পেয়ে বুড়োর তেম্নি সুখোদয়।
পাঠিয়ে তাদের রাহা খরচ তড়িৎ-যন্ত্র-যোগে
হেথা বুড়ো লেগে গেল বিবাহ উদ্যোগে।
প্রয়াগ ধামে কন্যা এলে করবে বিয়ে তায়,
আনন্দেতে বুড়োর দেহে যুবার শক্তি বয়।
তার পরেতে আরো মজা শুন চমৎকার,
তিনটি মেয়ে নিয়ে হাজির জনক কন্যার।
বড়টিরে সমর্পিতে পিতার প্রাণ চায়,
কনে দেখে জ্বলে গেলেন পাত্র মহাশয়।
প্রৌঢ়া মেয়ে বিয়ে করতে তিনি রাজী নন,
তিরিশ যে তারি তরে ব্যাকুলিত মন।
কনের বাপ বলে শুন, পাত্র মহাশয়
বড় রেখে ছোটর বিয়ে সে ত নাহি হয়।
ঝগড়া ঝাঁটি কাজ নাইক হিত কথা কই,
শুভ লগ্নে বিয়ে কর বড়, মেজ, দুই।
ব্যাপার দেখে ভাবে বুড়ো এত মন্দ নয়
একটা বিয়ে দুটা হ'ল ভাগ্য পরিচয়।
বড় গিন্নী দাসী রূপে থাকবে গৃহে মোর,
ছোট নিয়ে আনন্দেতে থাকব আমি ভোর।
রান্না বান্না কাজ কর্ম্মে দিব নাক তায়,
এই না ভেবে বিবাহেতে দিল বুড়ো সায়।
ফাল্গুনে শুভ তিথিতে মধুর বসন্ত,
মেজে গুজে চল্ল বুড়ো বিবাহ সভায়।
ছাঁদনা তলায় বর দাঁড়াল বলিহারি যাই,
চুলে কলপ তোবড়া গালে দাঁতের বালাই নাই।
দুই কন্যা বরণ হল চোদ্দ পাক দিয়ে,
এক সঙ্গে মন্ত্রপূত করে নিল দুয়ে।
বিয়ে করে ছোট নিয়ে পাল্কি চড়ে যায়,
বড় চল্লেন দাসীরূপে, কে দেখে তাহায়।
পথের মাঝে দেশের যত নব্য ছেলের দল
সঙ্গে সঙ্গে চল্ল সবে বাজিয়ে করতাল খোল।
তার পরেতে ফুলশয্যা শুন সভাজন,
ঘর বিছানা সাজাইতে দিল বুড়ো মন।
দেশের যত যুবকবৃন্দ দিয়ে মালা ফুল
বুড়োয় দিল সাজাইয়ে বল হরিবোল।
বুড়ো মড়া মলে যেমন সাজায় তারে সবে,
সাজিয়ে তেম্নি হরি হরি বলে উচ্চ রবে।
বল হরি, হরি বোল, বল হরি বোল,
বুড়োর বিয়ে প্রয়াগ ধামে পড়্‌ল হাসির রোল।

শ্রীনীরদবরণী দেবী।

৩১ নং মধুরাই লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার বসু কর্ত্তৃক ৩০নং আউনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

রামারচনা—অতিরিক্ত।

কলার মান্দাসে "বেহুলা"।

অনন্ত জলধি রূপে আলো করে,
কে গো তুমি সতি! ভেলার উপরে,
জানিতেছ সদা ব্যাকুল অন্তরে,
কোথায় তোমার গন্তব্য স্থান।
কেন সতি তব নয়ন আসার
ঝরে অবিরল ঝর ঝর ধার,
কি হয়েছে দেবি বদনা তোমার,
কি ব্যথা ছেয়েছে ও নব প্রাণ?
আহা একি দেখি, বসন ভিতরে,
পতি-শব-দেহ সযতনে ধরে,
চলিয়াছে সতী, ভেলার উপরে,
নাহি দিক্ লক্ষ্য হে দিকে যায়।
সিমন্তে সিন্দুর শোভে শতদল,
অলক্ত-রঞ্জিত চারু পদতল,
সধবার বেশ রয়েছে সকল,
বুকে মৃত-পতি কেনরে হায়!
বাসর বৈধব্য, একি অঘটন,
ঘটিল তাহাই, তোমার জীবন,
হল সুখি শেষ, অলার ক্রন্দন
ভরিতে লাগিল স্বজন সব।
দেখা তুমি সতি হয়ে অচঞ্চল,
ধৈরয ধরিয়া দেখিলে সকল,
মৃত ব্রতে ব্রতী নব বলে বল,
পতি সনে যাবে প্রতিজ্ঞা তব।
আত্মীয় স্বজনে, ফেলি শব দেহ,
গেলবে চলিয়া, নিজ নিজ গেহ,
তুলিয়া যতনে, মৃতপতি-দেহ,
ভাসালে অকূল সাগরে তরি।
ভ্রাতা আসি তব, ফিরিতে তোমায়,
বলিলেন হয়ে স্নেহার্দ্রহৃদয়,
আয় রে বেহুলে ফিরিয়া আলয়,
যাসনে তোরে মিনতি করি।
কহিলে তাঁহার কথার উত্তরে,
যাইব না আমি, যাও তুমি ফিরে,
জানাও প্রণাম পিতা ও মাতারে,
ছাড়িয়া চলিনু জনম মত।
এ মুখ দেখাতে চাহি নাকো আর,
পতিহীনা নারী সংসারের ভার,
প্রতি গৃহে ফেরি কি লাঞ্ছনা তার,
সহেগো নীরবে যাতনা কত।
শত বাধা বিঘ্ন করি অতিক্রম,
নেতা ধোপানীর ঘাটেতে তখন,
আসিয়া পৌঁছিলে, শ্রান্ত ক্লান্ত মন,
বিশ্রামের তরে লাগাগে তরি।
দেখিলে তথায় আশ্চর্য্য ঘটন,
তাহাতে স্তম্ভিত হল তব মন,
বসিয়া দেখিতে লাগিলে তখন,
কি বিচিত্র ইহা আহা মরি মরি!
শিশু পুত্র ছিল, ধোপানী নেতার,
শত ব্যথা দেয়, কার্য্যেতে মাতার,
মারিয়া তাহারে, শব দেহ তার,
রাখিল ভূমির উপরে ফেলি।
ফিরিবার কালে আবার তাহারে
বাঁচাইয়া লয়ে যায় সঙ্গে করে,
দেখিয়া তাহার দু চরণ ধরে,
জানালে কাঁদিয়া ঘটনাগুলি।

মলিত তোমায় দেখিয়া নেতায়
অন্তরে লাগিল ব্যথা করুণায়,
বাঁচাইয়া দিতে, পতিরে তোমার,
প্রতিজ্ঞা করিল নিকটে তব।
তাহার সহিত চলিলে তখন,
সুরপুর সেই, আনন্দ ভবন,
দেখিলে তথায় অপূর্ব্ব সুজন
কত যে বিচিত্র বিরাজে সব।
দেখাইল সেথা, প্রলোভন কত,
কিছুতেই সতি, নহ বিচলিত,
স্বকার্য্য সাধনে কি অটল চিত,
ধ্যান জ্ঞান সেই মৃতপতি পায়।
মনসার কোপে গিয়েছিল হায়!
ভয়ানী ভাসুর কৃতান্ত-আকার
তুমি পুণ্যময়ী নিজ তেজে তার
দিলে গো জীবন দেবীর প্রায়।

ছিল রাজপুরী, প্রজা অগণন,
আনন্দে মগন, পুরবাসিগণ,
মনসার কোপে, সকলি স্বপন
গিয়েছিল সব মুহূর্ত্তে মিশি।
সকলি ফিরালে সতীত্বের বলে,
অন্ধ সনকার চক্ষু প্রদানিলে,
মৃতপতি লয়ে আবাসে ফিরিলে,
উঠে জয়ধ্বনি হেথা দশদিশি।
বাজিল মাদল, শঙ্খ অগণন,
আনন্দে অধীর পুরবাসিগণ,
কুসুম চন্দনে করিয়া বরণ,
রাখিল তোমায় নিখিলের-রাণী।
ধন্য ধন্য সতি বেহুলে সুন্দরি!
শাপভ্রষ্ট হয়ে এসে মর্ত্তোপরি,
অক্ষয় সুযশে এ ভারত ভরি,
তুষনে নিশালে অনন্ত ধামে।

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী।

মর্ম্মগাথা।*

১

আজি বল মোরে বল।
সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল?
যে মুখ হেরিলে পরে
শত দুঃখ যায় দূরে,
হেরিলে সৌন্দর্য্য যার হাসিত ভূতল!
তার কেন অশ্রুঝরে বল মোরে বল!

২

সোণার প্রতিমা কেন ফেলে অশ্রুজল!
(যার) ফুটন্ত পদ্মের মত
আঁখি দুটী উজ্জ্বলিত,
গভীর অমিয়-মাখা যে মুখ কমল!
কেন তার অশ্রু ঝরে বল মোরে বল?

৩

স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি জল?
যে মুখ হাসিতে ভরা
হাসিতে ভুলান্ত ধরা,
কভু তো হেরিনি তার আঁখিভরা জল!
আজ তবে, হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল?

৪

(আজি) স্বর্ণ-প্রতিমার চোখে কেন দেখি
জল?

---

* কোনও দুঃখী পরিচিতা বালবিধবা দর্শনে লিখিত।

যাহার সুন্দর কান্তি
হেরিলে ঘটিত ভ্রান্তি
দেবী, কি মানবী, মনে হ'তো টলমল।
হিরণ্ময়ী কেন কাঁদে বল মোরে বল!

৫

আজি মোরে বল তোরা একবার বল!
তার সেই মুখ স্মরি
আর যে থাকিতে নারি
হ'তেছে শতধা চূর্ণ মোর হৃদিতল!
সে কেন বিষণ্ণমনা, বল মোরে বল!

৬

আমি কি ভ্রমেতে পড়ি হেরিতেছি ভুল।
না! না! সে তো একমনে
বসে, দেখি নিরজনে
নীরবে নিশীথে ধীরে ঢালে অশ্রুজল!
আমার তো ভ্রম নহে, কি হ'য়েছে বল?

৭

(অয়ি) স্বর্ণপ্রতিমে! কেন ভাস অশ্রুজলে?
বুঝেছি বুঝেছি সতি!
তোর যে দেবতা পতি
কাঁদায়ে গিয়াছে বুঝি নাই ধরাতলে?
তাই কি গো হিরণ্ময়ী! ভাস অশ্রুজলে?

৮

(হায়) কে মোরে হানিল আজি এ নিষ্ঠুর বাণ?
কে শুনাল এই বাণী,
(তায়) কিবা প্রাণ নাহি জানি।
এ নিষ্ঠুর বাণী কেন শুনিনিরে কাণ!
শুনিবার আগে কেন ত্যজিলে না প্রাণ?

৯

(ভগ্নি) বিধাতা কি তোর ভালে এই লিখেছিল?
(কত) আদরের আদরিণী
(ক'রে) রেখেছিল শ্বশ্রূরাণী
বধূরূপে ছিলে তাঁর ঘর করি আলো!
কেন এ সুখের মাঝে অনল জ্বলিল?

১০

(ভাই) মোর সাথে আলাপন করেছিলে বলে।
তাই কি এমন আজি ঘটিল কপালে?
(হায়) অভাগা যথায় যায়
সাগর (ও) শুকায়ে যায়,
তাই বুঝি মোর স্পর্শে কমল মুকুলে।
ফুটিতে না ফুটিতেই অকালে শুকালে?

১১

(আজি) আয়রে ভগিনী তোরে হৃদে ধরি আয়!
কি ব্যথা পেয়েছ আজি জানাবে তা কায়?
(এ) অসহ্য বেদনা জ্বালা,
কোথায় জুড়াবে বালা,
সমদুখী না হলে কে বুঝিবে বেদন!
তাই বুঝি আমি মোর পুড়িতেছে প্রাণ?

১২

আয়রে ভগিনি আজি ধরি হৃদয়েতে
তুমিও আমার মত দুঃখী এ জগতে?
কি ব'লে বোঝাব ভাই,
ক্ষমতা কি আছে ছাই,
(তবে) ধর্ম্মের পথেতে সদা রাখি প্রাণমন,
দেবী হিরণ্ময়ী নাম করিও ধারণ।

১৩

আমি তো সামান্য ভাই কিছুই জানিনে।
(তবে)
(ভাই) যেখানে যে ভাবে থাকো,
তাঁহারে হৃদয়ে রেখো,
সংসারের পথে ভাই নানা প্রলোভন,
'ভুলনা' তাদের ডাকে, সেই 'ভগবান।'
সবে তব চৌদ্দ বর্ষ,
(আছে) কত সুখ কত হর্ষ
কঠিন পরীক্ষা মাঝে কত যে পড়িবে,
সে সবার মাঝে কভু তাঁরে না ভুলিবে॥
(ভাই) দেখো করি তত্ত্ব তত্ত্ব
সেই এক তিনি ভিন্ন,
সুখে দুঃখে চিরবন্ধু নাই অন্য জন,
(যেন) তাঁহারে পূজিতে ভাই ভুলনা কখন॥
তোমার সমদুঃখিনী ভগিনী—
শ্রীমতী—

পারিজাত।

পারিজাত—এই কবিতা পুস্তকখানিতে বিশেষ নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব আছে। ইহার কতকগুলি কবিতা ফরাসী, জর্ম্মাণ ও পারস্য ভাষার কবিতার ছায়া অবলম্বনে লিখিত। কবিতাগুলি সুন্দর, সরল ও হৃদয়গ্রাহী। যাঁহাদিগের কবিতাতে রুচি ও ভালবাসা আছে, আশা করি, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যুগপৎ আনন্দোপভোগ ও উপদেশ লাভ করিবেন। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। প্রার্থনা আমাদিগের বঙ্গলক্ষ্মীরা এক এক খানি ক্রয় করিয়া পাঠ করেন। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে একজন পরিচিত প্রবীণ লেখক।

প্রাপ্তিস্থান—৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন, বামাবোধিনী কার্য্যালয়; ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, চক্রবর্ত্তী, চাটুর্য্যে কোম্পানী (Chuckervertty, Chatterjee & Co.) ও সংস্কৃত প্রেশ ডিপজিটরী, কলিকাতা।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধকাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয়রে, ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বৈশাখ সংখ্যা হইতে বামাবোধিনীর বিশেষ উন্নতি সাধনের আয়োজন করা হইয়াছে। এই সংখ্যা হইতে বামাবোধিনী যাহাতে পাঠক পাঠিকাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না। নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী।

কভারের চতুর্থ পৃষ্ঠা	মাসিক	...	...	...	৭৲
" দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৬৷৹
" তৃতীয় পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৬৲
বিজ্ঞাপনের প্রথম পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৫৷৹
পাঠ্য শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৪৷৹
প্রত্যেক সাধারণ পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৫৲
" " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	...	...	৩৲
" " সিকি পৃষ্ঠা	"	...	...	...	২৲
" " অর্দ্ধ সিকি পৃষ্ঠা	"	...	...	...	১৷৹

বিজ্ঞাপনের ইহাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিলে টাকা প্রতি ৸৹ কমিশন পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ,
৩৯ নং আণ্টনীবাগান লেন, কলিকাতা।

নূতন পুস্তক।

ম্যাডাম্ গেঁয়ো।

শ্রীমতী নির্ম্মরিণী ঘোষ প্রণীত।

মূল্য সুন্দর বাঁধান ১৲, কাগজের মলাট ৸৹।

গ্রন্থকর্ত্রীর লিখিত "মৌনীকস" ইতোমধ্যেই ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে সিদ্ধার্থের ন্যায় ধর্ম্মজীবন পাঠ করিতে চান, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব জীবনী অবশ্য পাঠ করিবেন। মূল্য ৷৷৹ মাত্র।

এই দুই খানি গ্রন্থ কলিকাতা ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এস্ কে লাহিড়ীর পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা পটুয়াটুলী আমার নিকট পাওয়া যায়। শ্রীবঙ্কবিহারী কর, প্রকাশক।

বা, বো, বিজ্ঞাপন।

বিশুদ্ধ কস্তুরী।

যাহার অভাবে কস্তুরীঘটিত ঔষধ সুচারুরূপে প্রস্তুত হয় না, এক্ষণে চিকিৎসকগণের প্রফুল্লিত হওয়া উচিত যে, আমরা সেই খাঁটি মৃগনাভি সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতেছি। মূল্য ১নং ৩০৲, ২নং ২৫৲, ৩নং ২২৲ প্রতি ভরি।

কাশী এবং বেনারস শীল্‌ক।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ইহাও প্রস্তুত করাইয়া সরবরাহ করি। পত্র পাইলে মূল্য-তালিকা পাঠাইয়া থাকি। হরিশঙ্করলাল, রামশঙ্করলাল্‌জ নেপালি। বেনারস সিটী।

বামাবোধিনী, সুপ্রভাত প্রভৃতির লেখিকা—
শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

"শিশির"

সুকবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহোদয়ের "আশীর্ব্বাদ" ভূমিকাসহ। জষ্টিস শুরুদাস বাবু, সারদা বাবু, হীরেন্দ্র বাবু, জ্যোতিরিন্দ্র বাবু, শ্রীযুক্তা মানকুমারী প্রভৃতি মহোদয় ও মহোদয়াগণ এবং বামাবোধিনী, নব্যভারত, সুপ্রভাত, হিতবাদী প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকল অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ।৵০ চারি আনা মাত্র। কলিকাতার সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে গ্রহণ করিলে বামাবোধিনীর গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অর্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। ডাকমাসুল স্বতন্ত্র।

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেনগুপ্ত,
রামতনু ডাক্তারের বাসা,
ষাটফরাদবেগ, চট্টগ্রাম।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 623. July, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬২৩ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩২২। জুলাই, ১৯১৫। } ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

মনীষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

তাহার পর কয় দিন কাটিয়াছে, মনীষা খুব গম্ভীর হইয়া শয়ন-কক্ষের একটা কোণে বোনা, সেলাই ও পড়া লইয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে দিন কাটাইতেছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহে না, সংসারের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান পুরাণ ঝিই সব করে, কেবল অতি প্রয়োজনীয় দুই একটা কায, যাহা না করিলেই নয়, তাহাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে মনীষা সারিয়া থাকে।

মহেন্দ্রনাথও বাহিরে বৈঠকখানায় বন্ধুদিগকে লইয়া দাবাবড়ের মধ্যে খুব জমিয়া গিয়াছেন। মনীষার আকস্মিক আবির্ভূত ঔদাসীন্যটা তিনি যেন খুব উপেক্ষার সহিতই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নিজের দিনগুলা প্রচুর স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া নিরুদ্বেগে কাটাইয়া দিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত। সংসারের ছোট খাট খুঁটি নাটী গুলা যেন নিতান্তই অগ্রাহ্যের সহিত এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ। এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি খুবই স্বচ্ছন্দ হইয়া দিন কাটাইতেছেন।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের বেলায় দীনু দুবের দিনগুলা কেমন অসহ্য নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে আজ ছয় মাস মনীষার কাছে রহিয়াছে, কই কেহত একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার স্বাধীন আনন্দে হস্তক্ষেপ করে নাই! তবে একি হইল? কার অভিশাপে এ দুর্দ্দৈব ঘটিল? আগে ত সে কত দুষ্টামী করিয়া বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইয়াছে, মনীষার আদেশে কাহারও

কিছু ফরমাস খাটিতে গিয়া যখন সে পথে খেলিয়া, প্রচুর বিলম্ব করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে এবং তিরস্কারোদ্যতা মনীষাকে যখন করিত কৈফিয়ৎ বাৎলাইতে গিয়া হাসাইয়া দিয়াছে, কই তখন ত কেহ তাহাকে কিছুই বলে নাই। তবে এখন অকারণ কেন এমন অবস্থান্তর ঘটিল? এই যে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত দিনটা হেথা হোথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—তা দিনান্তে মনীষা একবার ডাকিয়া সুধাইতেও ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কি কম আক্ষেপ? অভিমানে সময় সময় তাহার চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিত, না, সে এত বরদাস্ত করিতে পারে না, মাইজীর এ নীরব গাম্ভীর্য্য—সমস্ত বিশ্বচন্দটাকে যেন বেসুর করিয়া তুলিয়াছে, সে কি করিয়া মামলাইয়া থাকে বলুন তো?

সে দিন মিশরাইন (মিশ্রাণী) ঠাকুরাণীর প্রাঙ্গণের টগর-গাছটীতে প্রচুর পরিমাণে টগর ফুটিয়াছে দেখিয়া তাহার মাথায় একটা চমৎকার মতলব গজাইল। সে মিশরাইনের ছোট মেয়েটীকে কতকগুলো সিগারেটের ছবি ঘুস দিয়া গাছ উজাড় করিয়া ফুলগুলি তুলিল। তারপর কথা-বাসনার সুতা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত, বহুক্ষণব্যাপী ধৈর্য্য সহকারে এক ছড়া মালা গাঁথিল, এবং তাহার মাঝখানে একটী সদ্যপ্রস্ফুটিত টুকটকে রাঙা জবা ফুলের খুপী ঝুলাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া গর্ব্বভরে সেটাকে বারম্বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আগিয়া মনীষার ঘরে ঢুকিল।

মনীষা তখন জানালার কাছে বসিয়া ছাঁটা ফুলের আসন ছাঁটিতেছিল, পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল, দীনুকে দেখিয়া তখনই তাহা নাবাইয়া আবার হাতের কাঁচির দিকে মন দিল। ইহারা সবাই খেপিয়াছে এবং তাহাকেও খেপাইয়া তুলিবার ঘোগাড় করিতেছে,—না, সে আর কাহাকেও প্রশ্রয় দিবে না। বিশ্বের সহিত তাহার সম্পর্ক কি?

মনীষার উদাসীন দৃষ্টি দেখিয়া নিমিষে দীনুর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল, মনীষার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার তাহার আর ভরসা হইল না। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে টেবিলের ফুলদান হইতে শুষ্ক ফুলগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহাতেই মালাটী সুবিন্যস্ত করিয়া ধবধবে সাদা ফুলগুলির মাঝখানে পদ্মরাগ মণির মত লাল জবাটা পরিপাটীরূপে সাজাইল।

তথাপি মনীষা কোন কথা কহিল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে সিগারেটের খালি বাক্স খুঁজিবার ছলে এদিক ওদিক ঘুরিয়া দীনু মনীষার নিকটে আসিয়া, মাটির উপর দুহাতে ভর দিয়া জানু পাতিয়া বসিল, এবং কষ্ট-বিকসিত হাসি-মুখে একটু 'হরদি' পশম প্রার্থনা করিল।

মনীষা পশমের বাক্স হইতে একটা ছোটগুলি তুলিয়া মেঝের ফেলিয়া দিয়া বলিল "নিয়ে যা"—

দীনু তৎক্ষণাৎ সেলী কুড়াইয়া লইল, কিন্তু যাইবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া উল্টা চাপিয়া বসিল, এবং আপন মনেই মনীষাকে ধীরে ধীরে শুনাইয়া দিল যে, শিবু কুর্ম্মির ছোট ছেলেটা, নীলমনিয়া (নিউমোনিয়া) বেমারে মর মর হইয়াছে, ডাক্তার দেখাইতে আজ হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেরা বলিতেছে আর বাঁচিবে না।—

মুহূর্ত্তমধ্যে মনীষা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল! সে কি যত ব্যাজ্‌পা লোকের সংবাদ বহিয়া আনিবার জন্য এই ছোঁড়াটাকে বাহাল করিয়াছে? না তাহাকে বিদ্রোহিতায় মাতাইবার জন্য ইহাকে মন্ত্র পড়িতে ডাকিয়াছে,—সে মুন্সেফের স্ত্রী, মুন্সেফ-পত্নীর মতই—সাধারণের নিকট হইতে সুদূরে পৃথক্ থাকিবে, না হইলে তাহার নিজের সম্ভ্রম যত থাক না থাক, আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির যে ভয়ানক অপমান করা হইবে! অতএব—মনীষা আরক্তমুখে বলিল "তা হয়েছে হয়েছে, আমি কি করব? আমি কি পীর না পয়গম্বর যে, হুকুমে রোগ আরাম করব?..... !

দীনু স্তব্ধনয়নে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল? মাইজীকে এমন কথা শিখাইল কে?.....

অপ্রস্তুত বালক খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল! মনীষা তখন কাঁচি ও কার্পেট ফেলিয়া দুই হাতে কপাল চাপিয়া একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৩)

উজ্জ্বল ফিকে ফিকে রাঙা মেঘে আকাশের চারি দিক রাঙিয়া উঠিয়াছে। ঈশান কোণে একখানা কাল মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। চারিদিকের গাছপালা গুলা সব স্তব্ধ ভাবে আঁকা ছবির মত স্থির হইয়া আছে গোটাকতক আহারলুব্ধ পক্ষী কেবল চঞ্চল ভাবে আকাশের কোলে ঘুরিতেছিল।

মহেন্দ্রনাথ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মনীষা একা দ্বিতলের বারেন্দায় অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার এই কর্ম্মহীন সন্ধ্যা সকাল গুলো যেন দিনে দিনে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনটা কেবলই বাঁধন ছিঁড়িয়া কোন একটা নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ছুটিবার জন্য সময় সময় বড়ই অধীর হইয়া উঠে। তাহার দিন রাত যেন আর কাটে না, বিশেষতঃ ঐ বৈকালবেলা!—সমস্ত কায কর্ম্ম সারা হইলে প্রাণটা কেবলই হু হু করিয়া উঠে—তাইত! এবার কি করি!

তাহার কায নাই, ক্লান্তি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, আছে শুধু চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া একটা গুরুভার অবসাদ। প্রতি মুহূর্ত্ত সে যে কি অসুস্থতায় কাটাইতেছে, তাহা বলিবার নহে,—কিন্তু আর এ রকমে সময় কাটে না।

ঈশান কোণের মেঘখানা ক্রমশঃ ঘোরাল হইয়া চারিদিকের আকাশের সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্রের উপর একটা নিষ্ঠুর কাল যবনিকা টানিয়া দিল। আসন্ন বর্ষণোন্মুখ মঙ্গল বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, জল নামে বুঝি!

মনীষা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। আহা তিন বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণশীল সন্ধ্যার সময় তাহার কিশোর জীবনের সেই একমাত্র স্নেহের পুতুলটী কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে!—ঠিক সে আজ তিন বৎসর!

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আজ কোথায়—আজ কোথায় তাহার সেই স্বর্গ পারিজাত সোণার শিশু?—আজ তিন বৎসর সে যে মার বুক খালি করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে!—সে কেন তাহাকে এত শাস্তি দিয়াছে,—এক বৎসরের জন্য মার কোলে আসিয়া,—সমস্ত জীবনব্যাপী ক্ষোভে মার বুক ভরিয়া দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে গো?—মনীষা প্রাণ ভরিয়া তাহার যত্ন করিতে পারে নাই, শুশ্রূষা করিতে পারে নাই,—চিকিৎসা করাইতে পারে নাই,—বাছা যে দৈন্যের পীড়নে বড় অনাদৃত ভাবেই ভুগিয়া ভুগিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে বেদনা যে মরিলেও যাইবে না!—মনীষা আর দাঁড়াইতে পারিল না, ঘরে ঢুকিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সহজে কাঁদে না, কাঁদিতেও পারে না—তাহার বড় ভয় পাছে তাহার কান্না দেখিয়া আর কেহ কাঁদিয়া ফেলে। আজ চারি দিক নির্জ্জন—কেউ কোথাও নাই, তাই সে প্রাণ খুলিয়া আজ প্রাণের বোঝা নামাইতেছে।

বাহিরে সজোর হাওয়ার সহিত সবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমশঃ বেশী হওয়ায় বৃষ্টির বেগ ক্রমেই হ্রাস পাইল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছিল, মাঝে মাঝে কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রধ্বনি হইতে ছিল। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া গেল, আর ক্রুদ্ধ দানবের মত বিকটতাণ্ডবে লাফালাফি করিয়া—চারি দিক কাপাইয়া, গোঁ—গোঁ—শব্দে ঝড় বহিতে লাগিল।

মনীষার বুকের ভিতর আজ শোকের তুফান উথলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের ক্ষুদ্র জীবনীর সমস্ত স্মৃতিটুকু আজ এক-যোগে তাহার নিভৃত বেদনা-মণ্ডিত হৃদয়টা মুহুর্মুহু আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে,—পুত্রের মৃত্যুর দিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা যতই দুঃসহ হউক, কিন্তু তাহার চেয়েও তীব্র জ্বালাদায়ক স্মৃতি যে সেই রোগে জীর্ণ ক্ষুদ্র জীবনের প্রত্যেক দিনগুলার প্রত্যেক অভাবের মুখে—দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা!—পয়সার অভাবে,—নিজেদের শিক্ষার অভাবে—ছোট শিশুর ছোট সেবায় কত বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম, অমার্জ্জনীয় ত্রুটি ঘটিয়াছে! ওঃ নিরুপায় ক্ষোভে বুক যে ফাটিয়া

যায়? বৃদ্ধা শাশুড়ী, তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর যখন আছাড় খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন "তুই কেন গেলিরে মাণিক"—তখন মনীষা তাইত শুধু ক্ষুব্ধ বেদনায় আক্ষেপ করিয়াছিল "তুই যে বড় দুঃখ পেয়ে গেলি বাবা!"—তাহার দুঃখ শুধু ঐ টুকু, অবোধ জীব বড় দুঃখ পাইয়া গেল। নিজের কথা ভাবিয়া—কেন গিয়াছে বলিয়া—সে একবারও শোক অনুভব করে নাই—নিজেদের অপরাধের জন্যই সে শুধু সন্তপ্ত হইয়াছিল।

পৈতৃক সম্পত্তি যা কিছু ছিল তাহা ঘুচাইয়া এবং মনীষার গহনা কয়খানি বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে খরচ জুটাইয়া স্বামী আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন সবে জেলাকোর্টে ঢুকিয়াছেন। কাযেই তখন ঘরের কড়ি ভাঙ্গিয়া কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটান হইতেছে, পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষেই হোক, আর পচা পুকুরের জল মিশান গাই দুধ খাইয়াই হোক, আট মাস বয়সেই শিশু—যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হইল। মামুলী প্রথামত প্রথমতঃ জলপড়া, তেলপড়া, পরে পাঁচু, গোপাল ও পঞ্চাননের চেলাগণের চিকিৎসা চলিল, শিশু দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল, কোন ঔষধই ধরিল না। অবশেষে গ্রামের কবিরাজ আসিলেন, দিনকতক তাঁহার চিকিৎসার গুণে শিশু ভালই রহিল, তাহার পর আবার যে সেই। পয়সা নাই যে ভাল চিকিৎসক আনান হয়। অনেক চেষ্টা ও চিন্তার পর দেনার উপর দেনা করিয়া সহর হইতে চিকিৎসক আনান হইল, কিন্তু হায়—তখন যে আর চিকিৎসার সময় নাই, পরদিন সন্ধ্যার সময় বালকের মৃত্যু হইল!

সকলে সান্ত্বনা দিল যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! সে যে ও কথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। আগাগোড়া অনিয়মে ও ত্রুটিতে ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত করিয়া শেষের দিকে সেই টানা হেঁচড়ায় আর কি কোন ফল হয়?—সে যেন আরো মর্ম্মান্তিক যাতনা বলিয়াই মনে হয়।

হইতে পারে শিশুর নিয়তি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যাউক, তাহাতে দুঃখ কি, কিন্তু তাহার জন্য যে কর্ত্তব্যগুলা তাহাদের করিবার ছিল, সেগুলো কি তাহারা সব করিতে পারিয়াছিল? না না, তাতো পারে নাই,—তাহার কিছুই যে পারে নাই গো—সেই টুকুই যে দুঃখ?

আজ তাহার স্বামী উপার্জ্জন করিতেছেন, আজ তাহাদের সমস্ত সৈন্য, সমস্ত অভাব ঘুচিয়াছে, তাইত আজ এ স্বচ্ছলতার মাঝে বসিয়া—আকুলতায় তাহার বক্ষঃস্থল ভরিয়া উঠিতেছে!—সে জোর করিয়া সব ভুলিয়া থাকিতে চায়। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না, তবু—ওগো তবুও গোপন অন্তঃকরণ হইতে যে সেই অতীত কাহিনীর

একটা অক্ষরও মুছিয়া যায় নাই?—তা যে সবই তেমনি উজ্জ্বল অটুট আছে?

হায়! মানুষ, মানুষের কাযের বাহির দিকটা দেখিয়া তাহার 'আঁতে ঘা' বসাইয়া বুক ভাঙ্গিয়া দেয়, সে জানে না ইহার ভিতরটায় কিছু আছে কিনা—কোন্ আবেগের উৎস তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে সেটা সে বুঝিয়া দেখে না, খুঁজিয়া দেখিতে চাহে না। মানুষ বাহিরের হাত পা গুলা লইয়া কি করিতেছে—সেই টুকুর উপরই শুধু তাহার তীব্র দৃষ্টি! ওগো সে কি করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, অন্তরের কি দুর্বহ নিগূঢ় বেদনাকে সে এই প্রকাশ্য স্থূলতার মাঝে সূক্ষ্ম তৃপ্তিতে সার্থক করিয়া লইতে চায়?—সে কোন প্রমাণে দেখাইবে যে, সে কে ঐ দরিদ্র দুঃস্থের সেবার মাঝে নিবিড় ভাবে আপনাকে মিশাইয়া দিতে চায়,—তাহা পশ্চাতের কোন অসহ্য তাড়নায়? সম্মুখের কোন শান্তিময় আশায়?—

না গো না, পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ মানুষ নির্ব্বোধের দুর্ব্বলতার ক্ষমা করিতে জানে না।—ভগবান্ নিজে যখন তাহার বুক খালি করিয়া পুত্রকে কাড়িয়া লইয়াছেন, তখন সে যে পরের পুত্রকে বুকে করিয়া ফাঁকী দিয়া শান্তি ভোগ করিবে, সে ত্রুটি কেহই সহ্য করিবে না!—সে যে নিজের তৃষিত মাতৃত্ব, অতৃপ্ত, বেদনা-ন্যস্ত স্নেহরাশি পরের শিরে ঢালিয়া হৃদয়টা হাল্কা করিয়া সুখী হইবে,—সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেহই ক্ষমা করিবার ক্লেশ স্বীকার পাইবে না। না করুক,—কাহারও উপর তাহার জোর নাই। কাহার উপরই বা সে অভিমান করিবে? যখন নিজের গর্ভজাত সন্তান হইতেও সে বঞ্চিতা, তখন পরের সন্তানের উপর এ ভূম্নাকুল মমতা মানুষ কেন সহ্য করিবে?

—অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে মনীষা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল "ওরে আয় বাবা আয়, একবার আয়, আজ তুই নেই বলে সবাই আমার পর,—তুই ছেড়ে গেছিস বলে কেউ আর বিশ্বাস করে আমার হতে চায় না—ওরে তুই একবার আয় বাবা!"

সহসা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন ডুবাইয়া, বাহিরের ঝড়ের গর্জ্জন ভেদ করিয়া,—ঠিক যেন সেই আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরের মতই কোথা হইতে কে আর্ত্ত-কণ্ঠে ডাকিল "মা—মা—মা!"

চকিতে উন্মাদিনীর মত দ্বার ঠেলিয়া মনীষা বারান্দায় আসিল, সত্যইত—ও যে সত্যকার আহ্বানই বটে!—ঐ যে আবার শুনা যাইতেছে মা—মা—।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কতকগুলি নরনারী উদ্দাম ঝঞ্ঝাশব্দ ভেদ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে ডাকিতেছে,—মা—মা রক্ষে করুন, গরীবদের জীবন বাচান!'

ঝড় বৃষ্টিতে ইহাদের ক্ষুদ্র কুটীর দুই-খানি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। দৃষ্টিহীন অসমর্থ জননী ও পরিবারস্থ কয়জন পুরুষ এবং একটী

মুমূর্ষু শিশু লইয়া স্বামী স্ত্রী আজ নিরাশ্রয়, এ বর্ষণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাথা গুঁজিয়া দুদণ্ডের মত দাঁড়াইবার স্থান নাই,—আশ্রয় দাও জননি,—অনাথদের আশ্রয় দাও।

মনীষা বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। সে এখনই না সন্তানকে ডাকিতেছিল? এখনই না সে তাহার বুভুক্ষিত সেবাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য অবলম্বন খুঁজিতেছিল, একি তাহাই? একি তাহাই? হাঁ তাহাই বটে!—নিশ্চয় তাহাই, তাহার মর্ম্মভেদী আকুলতার উত্তরে উহারাই যে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছে, উহারাই যে ডাকিয়াছে, মা!—

মনীষা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া নামিয়া গেল, তাহার চক্ষের জল তখন শুকাইয়াছে।

(৪)

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, জল ঝড় সমস্ত থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, নীল আকাশের কোলে বসিয়া শান্ত স্মিত শশধর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাশি ঢালিতেছেন। সে দিন শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী।

স্থানীয় উৎসাহী বিদ্বান্ ভদ্রলোক ও নিষ্কর্ম্মা যুবকবৃন্দের দ্বারা স্থাপিত "দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণী" সভার আজ অধিবেশন ছিল। কোর্টের কয়জন উকিলই সে সভার যথাবিধানে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। সুতরাং মুন্সেফ বাবুকেও সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইয়াছিল। জল ঝড়ের প্রকোপে সভা যথাসময়ে বসিতে পারে নাই,—সভ্যগণ সবাই জুটিলে তবে অনেক বিলম্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং একটু রাত্রি করিয়া সভাভঙ্গ হইয়াছে,—কারণ সভার সঙ্গে সভ্যকার কার্য্যের সম্পর্ক যতটুকু থাক না থাক,—প্রয়োজনাতিরিক্ত তর্ক বিতর্ক, এবং সভ্যগণের বক্তৃতার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল।

সেই তর্ক বিতর্কের ঘাত প্রতিঘাতে সভ্যগণের সকলের চিত্তই অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রনাথও পথে আসিতে আসিতে সেই কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সব মনস্বী বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্‌গণের উচ্চ উদ্দেশ্যগুলির পরিণাম, কেন এমন বিরক্তিজনক শোচনীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাঁহাদের উন্নত সঙ্কল্প সাধনের পথে এত বিঘ্নই বা কেন এবং তাহার সিদ্ধি ফলগুলিই বা এত বিকৃত কেন?

এই যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি ভদ্রসন্তান এত বাগবিতণ্ডার পর করিলেন কি না আবেদন নিবেদনের করুণ কাতরোক্তিপূর্ণ অনুনয়-লিপি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশে প্রেরণ মাত্র, আর কিছু নয়!—হাতে কলমে চূড়ান্ত কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া এবার সবাই নিশ্চিন্ত, আর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিছু নাই! এমন করিলে কি কাহারো কিছু সত্যকার শ্রেয়ঃ আছে? ইহাঁরা পৃথিবীর সমস্ত মালিন্য দূর করিতে চান, কিন্তু শুদ্ধাচারের

খাতিরে স্বয়ং কিছু স্পর্শ করিতে নারাজ, দূর হইতে ফুঁ দিয়া ইহাঁরা পর্ব্বত উড়াইতে চান!

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তিনি লণ্ঠনবাহক আর্দ্দালীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। সিঁড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ পাইয়া বৈঠকখানার পাশের ঘর হইতে ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি আলোক লইয়া বাহির হইল এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন নীচ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী পুরুষ বাহির হইয়া আভূমি-প্রণত-শিরে সমস্বরে ধর্ম্মাবতারের জয় ঘোষণা করিল। মহেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দু একটা প্রশ্নের পর সংক্ষেপে ইহাদের বিপদের কথা এবং ইহাদের আশ্রয়দাত্রী 'মা ঠাকুরাণীরা' করুণাময় বদান্যতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারাও না সকলে মিলিয়া এইরূপ আকারের একটা মহৎ কাজের কল্পনায় এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়া—সময় কাটাইয়া আসিলেন?—চকিতে তাঁহার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল, এতক্ষণের মধ্যে যথার্থ কায় করিল কে? বাহিরে গিয়া তিনি —না ঘরে বসিয়া তাঁহার সেই নগণ্যা পত্নী?

অকস্মাৎ তীব্র কশাঘাতের মত তাঁহার সে দিনকার সেই হৃদয়হীন রূঢ়তার কথা স্মরণ হইল!—ছিঃ, এই কাযের জন্যই—এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন। আজ যদি মনীষার মমতা-শ্রয়ে ইহারা স্থান না পাইত—তাহা হইলে এই দুঃস্থ বিপন্নগুলির কি দুর্দ্দশাই হইত?—

মুহূর্ত্তে নিজের সহিত স্ত্রীর আচরণ-গুলা মিলাইয়া নিজেকে একটা ভণ্ড বলিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল। তাঁহারা পরার্থপরতার মুখস পরিয়া—যাহারা লইবার জন্যই গরীবের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের সুখ দুঃখের সঙ্গে তাঁহাদের সত্যকার প্রাণের যোগ কতটুকু আছে? কিছুই না, তাঁহারা গরীবের প্রাণ বাঁচাইবার অছিলায় নিজেদের নাম কিনিতে চান মাত্র!—ধিক্! আর এই নারী,—কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের ভিতরকার সমস্ত শক্তিটুকু, নিজের প্রভাবে জাগাইয়া তুলিয়া—এতগুলি প্রাণীর সুখ সুবিধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, নিঃশব্দে এত কল্যাণ সাধন করিতেছে—তিনি বর্ব্বর, তাই এই কাজ হইতে এমন লোককে থামাইয়া রাখিয়া মান বাঁচাইতে চাহেন?

মহেন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহাদের সমস্ত মন্তব্য ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারিলেন না, বাধা দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো?"

তাহারা সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে কি ধর্ম্মাবতার? আমাদের শোবার জায়গা অবধি হয়ে গেছে,

শুধু আপনার জন্যে আমরা.....
.....।"

তাহাদের শয়নের আদেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে উপরে চলিলেন, ভৃত্য আলো লইয়া অনুগামী হইতেছিল, তিনি হস্তেঙ্গিতে বারণ করিলেন,—"আজ চাঁদের আলো আছে! সিঁড়ি দেখা যাইবে।"

উপরে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া তিনি কক্ষে ঢুকিলেন, দেখিলেন আনন্দ-ফুল্ল-মুখে উৎসাহিত-কণ্ঠে অনর্গল বকিতে বকিতে দীনুয়া পরম আরামে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতেছে, আর সদ্য-ধৌত বস্ত্র পরিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে এক হিন্দুস্থানী রমণী বাতাস দিয়া কড়াইয়ের আগুনের ছাই উড়াইতেছে, আর তাহার ওধারে বসিয়া—স্নেহাপ্লুত বদনে ক্রোড়স্থ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে, ওকে—মনীষা স্বয়ং!

মহেন্দ্রনাথের বুকে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল, মনীষার এ মনোহারিণী মূর্ত্তি তিনি যে আজ তিন বৎসর দেখেন নাই, আজ তিন বৎসর সে যে পুত্রহারা, উচ্ছৃঙ্খলা, আত্মবিস্মৃতা, যেন কেমন এক রকমের মানুষ হইয়া আছে,—আজ এত দিনের পর কোন শক্তিশালী প্রাণ,—তাহার সে লুপ্তগৌরব লাবণ্য উদ্ধার করিয়া আনিয়া—তাহাকে আবার ঐ সংহত সুন্দর নারীত্বে—ঐ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মাতৃত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিল? কে সে পরাক্রমশালী মহাশূর?

মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে কি এক অদ্ভুত বিচিত্র-রঞ্জিত শক্তি-স্পর্শে অকস্মাৎ রুদ্ধ নির্ঝর খুলিয়া অপার্থিব শান্তির উৎস ছুটিল, তাঁহার মর্ম্মের মধ্যে শুধু একটী উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল'—ধন্য ভগবান্!

মহেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র দীনুয়ার মুখরিত চাঞ্চল্য চকিতে অন্তর্হিত হইল, সেই শিশুর জননী হিন্দুস্থানী রমণী ত্রস্তে পাখা ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর মনীষা মাথায় কাপড় তুলিয়া রুগ্ন শিশুকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল।

মহেন্দ্রনাথ প্রীতি-উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিলেন "থাক থাক মনীষা ঐখানেই থাক, উঠো না—তোমার ও মূর্ত্তি যে এত সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী তা আমি জানতাম না। না বুঝে অন্যায় ভাবে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি ক্ষমা করো।"

মনীষা শুধু একবার কৃতজ্ঞ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তার পর শান্ত স্বরে বলিল "এস"।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্নেহের ইন্দুপ্রকাশের উদ্দেশে তাহার পত্নীর প্রতি। *

১

"বিগত সাতই "মে"তে, আটলান্টিক
সাগরেতে,
ডুবিয়াছে আমাদের সেই ইন্দুপ্রকাশ,"
শুনে নিদারুণ কথা, মরমে পশিল ব্যথা,
ভারতের কি দুর্ভাগ্য কে করে প্রকাশ!

২

ছিল ইন্দু কৃতিমান্, সাহিত্যিক সুবিদ্বান্,
নির্ভীক কর্ত্তব্যকর্ম্মা বীরের সমান,
উঠিয়া সে জ্ঞান-রথে চলেছিল ধর্ম্মপথে,
সরল বিশ্বাসে বুঝে সত্যের বিধান।

* ইন্দুপ্রকাশ "বিদ্যাসাগর জীবনী" লেখক প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। কলিকাতায় B. A. পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, তিনি কিছুকাল বঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য্য করেন, এবং কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া অল্প দিনের মধ্যে উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে গণ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করেন। কিন্তু ইন্দুপ্রকাশ এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না, আরও বিদ্যার্জ্জন করিবার আশায় নিজের চেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আমেরিকাতে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে বি, এ, ও এম, এ, পাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে কৃতিত্ব লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা হয়। লুসোটিনিয়ার যাত্রী হইয়া তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিতেছিলেন। বিগত ৭ই মে তারিখে, আয়র্ণ্ড টর্পিডোর আঘাতে জাহাজখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ইন্দুপ্রকাশ তেজস্বী, স্বাভাবতঃ মেধাবী ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন।

আমরা অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহাকে চিনিতাম, এবং তাঁহার এই উন্নতিতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, ভারতের একটি সন্তান আমাদের ভ্রাতা এইরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেন। তিনি এই বামাবোধিনীর লেখক হইয়া সময় সময় কত প্রবন্ধ দিয়া ইহার সাহায্য করিতেন। আমরা কত আশা করিয়াছিলাম যে, এবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের কত ভাল ভাল কথা শুনাইবেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে আমরা যে সরলতা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আভাস পাইতাম তাহা আর পাইব না জানিয়া দুঃখে মিয়মাণ হইতেছি। ইন্দুপ্রকাশ তাঁহার বিধবা পত্নী ও তিনটী শিশুসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। জগদীশ্বর তাঁহাদের প্রাণে সান্ত্বনা দিন এবং সেই অমর আত্মা দিব্য ধামে বাস করিয়া আরও জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত হইয়া দিন দিন উন্নত হউন, দয়াময়ের চরণে এই প্রার্থনা করি।

৩

বিদ্যা-উপার্জ্জন তরে, গিয়াছিল সিন্ধু পারে,
হয়ে সেথা সিদ্ধকাম আসিবে সে ঘরে,
বিখ্যাত অর্ণবযানে, 'লুসিটেনিয়া' নামে,
জার্ম্মাণের অস্ত্রাঘাতে ডুবেছে সাগরে।

৪

কত শত নরনারী, মেরে হ'ল পাপাচারী,
জগদীশ করিবেন ন্যায়ের বিচার,
মোদের স্নেহের ইন্দু, হেরি সে বিশাল সিন্ধু,
কেমনে ত্যজিল দেহ সম্মুখে কাহার?

৫

সাক্ষী তার দিবাকর, বিধাতা মঙ্গলাকর,
আর কেবা শুনিয়াছে আকুল ক্রন্দন,
'আমায় বাঁচাও বলে,' বুঝিবা নয়নজলে,
বলেছিল কত কথা কাপ্তেনে তখন?

৬

অকূল পাথারে পড়ে, হতবুদ্ধি নারী নরে,
কার কথা কে শুনিবে বিপদ যখন?
অসহায় নিরুপায়, কার দিকে কেবা চায়,
বলে,-"পিতা দয়াময় অনন্যশরণ!

৭

তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক, ছাড়ি আমি ইহলোক,
তোমার অভয় কোলে লই গো বিশ্রাম,
তব শ্রীচরণ ছায়, আছে মোর সমুদায়,
বিশ্বাস নয়নে দেখি পূর্ণ প্রেমধাম।"

৮

অটল বিশ্বাসভরে, দিল প্রাণ অকাতরে,
গভীর অতলস্পর্শ লবণাক্ত নীরে,
সমাধি হয়েছে তার, এ বিধান বিধাতার,
তাই এই শোকবার্ত্তা ঘোষিল অচিরে।

৯

ইন্দুপ্রকাশের নাম, করে সবে অবিরাম,
কত গৃহে উঠে আজ হাহাকার ধ্বনি,
বিদেশে অর্ণবযানে, ত্যজিলে গো কেন প্রাণে,
এই ভেবে দিবানিশি কাঁদেন জননী।

১০

প্রাণে ছিল কত আশা, প্রিয়জনে ভালবাসা,
কি যে মিষ্ট মাতৃভাষা বলিব কি তার,
বিদেশে বাঙ্গালী নাম, রেখেছিল মূর্ত্তিমান,
এক ছিল ধ্যান জ্ঞান ভাষার প্রচার।

১১

পিতা মাতা ভাই বোন, প্রাণের অপত্যগণ
বুঝে নাই তার দেহে দেখিবে না আর,
প্রিয়তমা ভার্য্যা তারে, আরো সুখী করিবারে,
চেয়ে ছিল তার প্রাণ সদাই এবার।

১২

"হায়! নারী পতিহীনা, দিবানিশি বিমলিনা,
তোর দশা দেখে প্রাণ কাঁদে সবাকার,
কি বলে সান্ত্বনা দিব, সকলের মূলে শিল,
এই ভেবে শোক তাপ ছাড় একবার।

১৩

সেবা কর কায়মনে, পতিবন্ধু গুরুজনে,
আর সেব শিশু তিনে বিধাতার দান,
তাহারা মানুষ হ'লে, ইন্দুর সন্তান বলে,
তোমার স্বামীর পুন হবে যশোগান।

১৪

আমরা হিন্দুর জাতি, সদা আনন্দেতে মাতি,
মানব-আত্মার মৃত্যু কভু শুনি নাই,
আত্মা সে অমৃত ধামে, সদা প্রেমসুধা পানে,
আনন্দেতে মাতোয়ারা শুধু ভাব তাই।

১৫

এ শুধু কল্পনা নয়, লও তার পরিচয়,
ডাক পিতা দয়াময় প্রেমের আধার,
চির ব্রহ্মচর্য্য লয়ে, নিষ্ঠাবতী সতী হয়ে,
নিশি দিন কর ধর্ম্ম সাধনা তাঁহার।

১৬

খুলে যাবে ব্রহ্মলোক, ইহলোক পরলোক,
একই পিতার কোলে আমরা সবাই,
পেয়ে পতি গুণবান্, পরিপূর্ণ হবে প্রাণ,
আর নাহি রবে ম্লান আনন্দ সদাই।"

কাকা বাবু।

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চেতগঞ্জ।

চেতগঞ্জ সহরের অন্তে অবস্থিত। যেখানে পুলিশ কোতোয়ালী অবস্থিত, সেখানে রাজা চেতসিংহের একটা বাজার আছে। চেতগঞ্জে হিন্দুদিগের পিশাচ-মোচন নামে কেবল একমাত্র তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। তীর্থযাত্রী মাত্রেরই এই স্থানটী দ্রষ্টব্য। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই স্থানে স্নান করিলে ভূত পিশাচাদির ভয় অথবা দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। প্রবাদ এইরূপ যে, একদা একটি পিশাচ বারাণসী ধামের পূত স্থানে ভয়ে ভয়ে আগমন করিতেছিল। পঞ্চকোশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাহার গতিরোধ করেন। কিন্তু পিশাচ অধিক বলশালী ছিল বলিয়া তাহার নিকট দেবতাগণ পরাজিত হন। ক্রমে পিশাচ "পিশাচ মোচন" পুষ্করিণী পর্য্যন্ত আগমন করে। এইখানে ভৈরবনাথের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভৈরবনাথ পিশাচের শিরশ্ছেদ করিয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট লইয়া যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করেন। পিশাচের শির-শ্ছেদ হইলেও সে বাক্‌শক্তিহীন হয় নাই। তাহার কাটামুণ্ড মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল। মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে পিশাচ এই বর প্রার্থনা করে যে তাহাকে যেন পূত স্থান হইতে দূরীভূত না করা হয় এবং গয়াযাত্রীরা যেন পূর্ব্বে পিশাচ-

মোচন স্থান দর্শন করিয়া গয়ায় গমন করে। মহাদেব 'তথাস্তু' বলিলেন। তদবধি লোকে গয়ায় গিয়া পিণ্ড দিবার পূর্ব্বে "পিশাচ-মোচন" দর্শন করিয়া যায়। কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞাত থাকায় উক্ত স্থানে গমন না করিয়া গয়ায় গমন করে, তবে পাণ্ডারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি বারাণসী ধামের পিশাচমোচনে পূর্ব্বে গিয়াছিলে কি না। এইরূপ অবস্থায় গয়াযাত্রীর যাহাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য বারাণসীধামস্থ পিশাচ-মোচনের প্রতিনিধি স্বরূপ গয়াধামে একটি পিশাচমোচন স্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যবসা ও উপজীবিকা।

বারাণসী ধামে বর্ত্তমান ব্যবসা তেমন কিছুই নাই। তবে সুতি ও চিকের কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে। ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি যে প্রস্তুত হয় না তাহা নহে। সাদাই হউক বা ফুলদারই হউক, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তানজেব এখানে পাওয়া যায়। মোটা কাপড়েরই প্রাচুর্য্য অধিক, পাতলা কাপড় তেমন দেখা যায় না। তবে তানজেবের কথা স্বতন্ত্র। এখানে কাপড় রঙ্গান অথবা কাপড় ছাপাই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বারাণসী ধামের খেলনারও আদর অধিক। আমরা যে তানজেবের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা বস্তুত মলমল। কাপড় ছাপিবার জন্য ছাঁচ আছে, তদ্দ্বারা ছাপাই কার্য্য হইয়া থাকে। ছাঁচগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। আম, শিশু বা আবলুস কাষ্ঠ ছাঁচ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। সূত্রধর ছাঁচ তৈয়ার করিয়া থাকে। তাহাকে নিম্নলিখিত হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে হয়:—

(১) "বেল হাঁসিয়া" (ফুলদার কিনারা) ৪ আনায় প্রত্যেক ছাঁচ।

২। "বেল বুটি" (ইহাতে একটা করিয়া ফুল থাকে) ঐ।

(৩) "বেল হাজি" (ফুলদার কিন্তু কোণাকোণী) ৮ হইতে ১২ আনায় ছাপা যায়।

(৪) "তহরীর" (অক্ষর, পদ্য, আকৃতি প্রভৃতি এই ছাঁচে থাকে) ২ টাকা হইতে ৪ টাকা একসেট।

একজন নিপুণ সূত্রধর কাষ্ঠের মূল্য ব্যতীত দৈনিক আট আনা উপার্জ্জন করিতে পারে। ছাপাওয়ালা গঁদ, খড়ি এবং শিরিষের একটা সংমিশ্রণ প্রস্তুত করে। যে কোন প্রকারের ছাপিতে হইবে তাহার ছাঁচ লইয়া উক্ত সংমিশ্রণে ডুবাইয়া কাপড়ে ছাপ লাগাইতে থাকে। অতঃপর রূপলী পাত লইয়া তাহার উপর রাখিয়া একটা গদি দ্বারা চাপিয়া দেয়। তাহাতে রূপলী পাতগুলি ছাপা স্থলে সংলগ্ন হইয়া যায়। রূপলী ছাপারও পার্থক্য আছে। কেহ কেহ রাঙ্গা, গঁদ, শিরিষ এবং খড়ি দিয়া একটা সংমিশ্রণ প্রস্তুত করে। ইহাতে ছাঁচটা নিমজ্জিত করিয়া ছাপিতে থাকে। দাগগুলি শুষ্ক হইলে কাপড়টীর উপর একটি কাষ্ঠ দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হয়। তাহাতে শ্বেত-

বর্ণের উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠে। ঘর্ষণ-কাষ্ঠটী মুহুরা নামে খ্যাত। শেষোক্ত প্রণালীর ছাপাওয়ালা মাসে ৪ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না।

ছাপিবার পূর্ব্বে প্রথমে কাপড়টাকে তিল বা রেড়ির তৈলে ডুবাইয়া সাজি মাটির জলে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে একজন ব্যক্তি তৈল ও অন্য এক জন সাজিমাটির জল লইয়া একটা নাদের উপর এপ্রকার উচ্চ হইতে ছাড়িতে থাকে যে, তাহা নাদে পতিত হইয়া যেন ফেনময় হইয়া যায়। অতঃপর কাপড়খানাকে তাহাতে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া লইতে হইবে। অনন্তর তাহাকে একটা সুবৃহৎ কাপড়ে বাঁধিয়া পরদিন শুষ্ক করিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া বার বার করিয়া যখন তৈলের গন্ধ থাকিবে না, এবং দাগও দেখিতে পাওয়া যাইবে না, তখন রজককে দিয়া কাপড়খানি নদী হইতে কাচাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর কাপড়ের কিনারা ছাপা হইয়া থাকে। এ ছাপাটী বেমালুম থাকে, সাধারণ লোকে দাগটী দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র নিপুণ ব্যক্তিই দেখিতে পায়। অতঃপর একটা কটাহে জল চড়াইয়া অগ্নির উপর রাখিতে হয়। জলে ফুট ধরিলেই তাহাতে পলাশবৃক্ষের কুটুল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়টা তাহাতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লইতে হইবে। কিয়ৎকাল পরে আরও মঞ্জিষ্ঠা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়টাকে উঠাইয়া লইয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ইহাতে পূর্ব্বকৃত ছাপার দাগগুলি যাহা একপ্রকার চক্ষের অগোচর ছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। ইহার পর রজক নদীতে ধুইয়া কাপড়খানি শুকাইতে দেয় ও মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা দিয়া তাহাকে আর্দ্র করে। মোট কথা কাপড়খানি একেবারে শুষ্ক না করিয়া ক্রমশঃ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়ার পর কাপড়খানি ছাপিবার উপযুক্ত হইবে। ছাপা কঠিন ব্যাপার। ফুলই হউক বা চেকই হউক একবার ছাপাতে সমাধা হয় না। বিভিন্ন রংগুলি বিভিন্ন ছাপায় ছাপিতে হইবে। ছাপিবার সময় ছাপাওয়ালা ছাঁচটী বাম হস্তে ধারণ করে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তদুপরি আঘাত করিয়া থাকে। পাছে হস্তে আঘাত লাগে তজ্জন্য দক্ষিণ হস্তে একটা চর্ম্ম জড়াইয়া লয়।

কাল রং তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বস্তু ও প্রক্রিয়ার আবশ্যক।

পুরাতন লৌহ...২০ সের।
গুড় ... ৫ সের।
তিল ...১০ ছটাক।

গুড়কে জলে গুলিয়া তাহাতে তিল ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতঃপর তাহাতে উল্লিখিত ওজনের পুরাতন লৌহ ছাড়িয়া দিয়া আট দিন পর্য্যন্ত ভিজিতে দেওয়া হয়। আট দিনে রং প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তখন তাহা লইয়া গঁদের সহিত মিশ্রিত

করিতে হইবে। এই রংটী তৈয়ার করিতে এক টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা খরচ পড়ে, কিন্তু রংটি বৎসরাবধি কার্য্য দিবে।

ধূসরবর্ণ তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির আবশ্যক :—

কাল রং (পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তৈয়ার হইলে) ৪ ছটাক।
ফট্‌কিরি... ৮ ঐ
সেরু..... ৪ ঐ
টাঁক (পলাশ) বৃক্ষের গঁদ...১২ ঐ

এইগুলি জলে মিশ্রিত করিলেই ধূসরবর্ণ প্রস্তুত হইল। ইহাতে ৫ আনা ১ পয়সা খরচ পড়ে এবং প্রায় ৯ খানা কাপড় ছোপান যাইতে পারে।

লাল রঙ্গের মশলা যথা :—

সেরু ... ৪ ছটাক।
ফটকিরি... ৮ ঐ
লোধ ... ৪ ঐ
হলুদ ... ½ ঐ
টাঁকের গঁদ ...১২ ঐ

লোধকে উত্তমরূপে পিসিয়া জলে ফুটাইতে হয়। ফুটিতে থাকিলে হরিদ্রা সংযোগ করিতে হইবে। অতঃপর ছাঁকিয়া সেরু, ফট্‌কিরি এবং গঁদ মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে ৬ আনা খরচ পড়িবে।

গাঢ় পীতবর্ণ প্রস্তুতের উপকরণ যথা :—

পলাশ পুষ্প...১ সের।
হরসিংসার ...২ ছটাক।
ফট্‌কিরি ...১ ঐ

পলাশপুষ্প জলে ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে হরসিংসার এবং ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া ফেলার পর গঁদ মিশাইতে হইবে।

বারাণসী ধামে চিকের ব্যবসাই প্রধান বলিয়া গণ্য। প্রায় বার সহস্র লোক এই ব্যবসায় নিযুক্ত, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। চিক, বঙ্গদেশ, মধ্য এসিয়া এবং চিনদেশ হইতে আসিয়া থাকে। শেষোক্ত দেশটীর চিক অতি উত্তম, দেখিতে পীতবর্ণ। মধ্য এসিয়ার চিক "মঙ্গল" নামে খ্যাত। ইহার বর্ণ হয় শ্বেত নতুবা পীত। ইহা সমরকন্দ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ হইতে যে চিক আমদানি হয় তাহা কলিকাতা, মালদা এবং রামপুরহাট হইতে আইসে। চিকের রং করাটা বারাণসীতেই হইয়া থাকে। রেশমী বস্ত্রের মধ্যে কমরখাব, কলাবতু, থান, সংগী, গুলবদন, মশরু, বুলবুলচশ্ম, এবং গেরিয়া তৈয়ার হইয়া থাকে।

এখানে পিত্তলের ব্যবসাও রীতিমত হইয়া থাকে। কাঁসারিগণ এই কার্য্যের মালিক। বারাণসী ধামে অনূন ৩০০ কারখানা আছে। বৃহৎ কারখানায় ২০ জনেরও অধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নিপুণ কারিকর পারিশ্রমিক অধিক পাইয়া থাকে।

উপজীবিকার মধ্যে জহরীর উপজীবিকাই শ্রেষ্ঠ। ইহারা হীরা প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তর বেচিয়া থাকে। মূল্যবান্ প্রস্তর নয় প্রকারের যথা—(১) হীরা (২) পান্না

(৩) যাকুত (৪) নীলম (৫) পুখরাজ (৬) লসনীয়া (৭) গোমেদ (৮) মুগা এবং (৯) মোতী। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকারের অহরত আছে তাহার একটির নাম লালরী এবং অপরটীর নাম কীতোজা। জহরীরা মূল্যবান্ প্রস্তর ক্রয় করিয়া কর্ত্তনকারীদিগকে কাটিবার জন্য দিয়া থাকে। এই কর্ত্তনকারিগণ আল-মাতরাস নামে খ্যাত। ইহারা হীরাকে তিন প্রকারে কাটিয়া থাকে, যথা—(১) পরব (২) পোলকি এবং (৩) কনওয়াল। ইহাদিগের পারিশ্রমিক প্রথমোক্তটীতে ৩ টাকায় রতি, দ্বিতীয়োক্তটীতে ৪ টাকায় রতি এবং শেষোক্তটিতে ৫ বা ৬ টাকায় রতি। হীরা কাটিতে হইলে "সান" নামক যন্ত্রের সাহায্যে কাটিতে হয়। অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর কর্ত্তন করিতে হইলে আরও তিন প্রকার "সানের" আবশ্যক হইয়া থাকে যথা—(১) রগড়াই সান, (২) মিহিন সান এবং (৩) জালা সান। প্রথমটী দেখিতে অতি কদর্য্য, দ্বিতীয়টী অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তৃতীয়টী কাঁসার। শেষোক্তটিতে পুখরাজ, যাকুত, পান্না, নীলম্ কাটা হয়। লালরী এবং অন্যান্য নরম প্রস্তর কাটিতে হইলে সানটী রঙ্গের হওয়া আবশ্যক। যদি ইয়ারিংএর জন্য হীরা কাটিতে হয় তবে তাহা দুই প্রকারে কাটা হইয়া থাকে যথা—(১) গোসওয়ালা এবং (২) বাদামচা। প্রথমোক্তটী পারাবতের অণ্ডের ন্যায় এবং দ্বিতীয়টী বাদামের ন্যায়। হিন্দুদিগের যেরূপ জাতি আছে হীরারও তদনুরূপ জাতি আছে। বর্ণহীন কাচের মত হীরা ব্রাহ্মণবর্ণের, লাল বা গোলাপী ক্ষত্রীয় বর্ণের, পীতবর্ণ হীরা বৈশ্য বর্ণের এবং ময়লা বা আবিল হীরা শূদ্র-বর্ণের।

কোরা হীরার মূল্যও একপ্রকার নহে। ইহাদিগের আকৃতি বিশেষে মূল্যও বিভিন্ন। (১) অষ্টাস, (২) লাড্ডু এবং (৩) খিলকি নামক তিন প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট কোরা হীরা দেখা যায়। শেষোক্তটি বাদামের আকৃতির ন্যায়। কর্ত্তিত হীরাও চারি প্রকারের। সর্ব্বোত্তম শ্রেণীর নাম "কৃতবী"। ইহা সমকোণ ভাবে কর্ত্তিত, (২) "আঠোঁয়া," ইহা অষ্টকোণবিশিষ্ট, (৩) "গীর্দা," ইহার উপরিভাগ গোল এবং (৪) "সরো"। শেষোক্তটীও তিন প্রকারের যথা—সরো, পান এবং ত্রিকোণী।

হীরা ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তর তিন প্রকারে কর্ত্তিত হইয়া থাকে—যথা (১) তউরা, (২) মথৌলা এবং (৩) তিনকরীদার। কর্ত্তনকারীদিগকে নিম্নলিখিত হারে পারিশ্রমিক দিতে হয়ঃ—

	তউরা	মথৌলা	তিনকরীদার
পান্না, যাকুত, নীলম, লালরী, পুখরাজ ইত্যাদি	১৲ রতি	।০ রতি	।০ রতি
গোমেদ	ঐ	ঐ	এরূপ কাটা হয় না।

মুগা কখনও কর্ত্তিত ভাবে আইসে

না। যখনই আইসে তখনই শাখা-বিশিষ্ট আইসে। ইহাকে কাটিয়া হয় দানা নয় তো লগিনারূপে পরিণত করিতে হয়। যাহারা শাখা কাটে, তাহারা তোলা প্রতি চারি টাকা লইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান্ প্রস্তরের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের প্রশংসা-সূচক বাক্যও আছে। পান্না সর্ব্বোত্তম হইলে প্রশংসা-সূচক বাক্য "সব্জবে আয়েব, কাঁচ কা টুক্‌রা", যাকুতকে "সুরখ যে আয়েব, কবুতরকী আঁখ" অথবা "অভ্‌লাস কা টুক্‌রা," নীলমকে "অলসিকা", পুখরাজকে "কুন্দন কী ডালী", লসনীয়াকে "বিল্লিকী আঁখ", মুগাকে "গুলাবী দানা," মোতীকে "দুধ কা কেনা, সীসেকী খীল" এবং লালরীকে "গুলাব কী পাত্তী" কহে।

জহুরীরা মূল্যবান্ প্রস্তর ক্রয়কালে তাহার বর্ণ, কাট এং শ্রেণী (বন্দি) দেখিয়া লয় এং কতদিনে সে তাহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে তাহারও আন্দাজ করিয়া ততদিনের টাকার সুদটাও যোগ করিয়া তদুপরি লভ্যাংশ রাখিয়া বিক্রয় করে। সুতরাং ক্রয়কালে জহুরীরা যে মূল্যে ক্রয় করে, তাহার দ্বিগুণ দরে বিক্রয় করে।

আমরা পূর্ব্বে মূল্যবান্ প্রস্তর কাটার কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ছিদ্র করার কথা বলি নাই। যাহারা ছিদ্র করে, তাহারা "বিধিয়া" নামে খ্যাত। ছিদ্র করার মজুরি যথা :—

হীরা ৫ টাকায় রতি
পান্না ১ আনায় রতি
যাকুত ১ ঐ
নীলম ২ ঐ
পুখরাজ ১ ঐ
গোমেধ ½ ঐ
লালরি ১ ঐ
ফিরোজা ১ টাকায় তোলা
মোতী ৮ আনায় তাঁক (২৪ রতিতে এক তাঁক)

এখানে সুগন্ধি দ্রব্য অতি অল্পমাত্রায় তৈয়ার হইয়া থাকে। ফুল ও অন্যান্য বনস্পতি হইতে নির্য্যাস বাহির করিয়া সুগন্ধ প্রস্তুত করা হয়। গোলাপ, কেতকী মৃত্তি, মকোই, লবঙ্গ, এলাচ, দেবু ঘরে, পুদিনা, নৌরি প্রভৃতি হইতে আরক বাহির করা হয়। আরক বাহির করিতে হইলে যে সকল পাত্রের আবশ্যক তাহার নাম ডেগ, নইচা এবং ভাটকা।

একটা ডেগে তিন ঘড়া জল ধরে কিন্তু তাহাতে দুই ঘড়া জল দিয়া বেশ সরস গোলাপ পুষ্প ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রত্যূষে ৬ টার সময় হইতে জাল দিতে আরম্ভ করিলে বেলা ৪ টার সময় আরক তৈয়ার হইবে। প্রথম নিষ্কাসিত আরকটা পরদিন পুনরায় চোয়ান হয়, তখন তাহা হইতে ১২ সের নির্য্যাস বাহির হয়। জ্বালানী কাষ্ঠ দিলে ৪ মন লাগে এবং তাহার মূল্য বড় জোর এক টাকা, দুই জন লোককে ডেগের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়। তাহাদিগের প্রত্যেকের মজুরী

দিলে দুই আনা লাভ। বর্ত্তমানে ১২৫০ টা ফুলের দাম এক টাকা। যদি মণার্থ হয়, তবে ৮০০ ফুলের দাম এক টাকা এবং অতি শস্তা ২০০০ (দুই সহস্র) ফুলের মূল্য ১ টাকা। মোট কথা ১২ সের গোলাপের আরখ তৈয়ার করিতে হইলে সাড়ে দশ টাকা খরচ পড়ে। আরখ বিক্রেতা টাকায় এক সের করিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে তাহাদিগের লাভ ১ টাকা ॥৵০ দশ আনা হইয়া থাকে। কেওড়ার আরখ জৌনপুর হইতে আইসে। মুথির আরখ ২ আনায় এবং মস্কোইয়ের আরখ দুই আনায় সের। এলাচের আরখ দুই প্রকারের। বড় এলাচের আরখ ১৪ আনায় এবং ছোট এলাচের আরখ ১৫ টাকায় সের।

নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে মিষ্টান্নই ভাল। এদেশে মিষ্টান্নের প্রকার নিতান্ত কম। বাঙ্গালা দেশে মিষ্টান্নের প্রকার যেমন অধিক, এদেশে তেমন নহে। জিলাবি দুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের নাম জিলাবি ও অন্য প্রকারের নাম "অমৃতি"। বালুসাই, পেড়া, লাড্ডু এই পাঁচ প্রকারের মিষ্টান্নই এদেশে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত পুরীর ন্যায় (লুচীর) মান কম নহে, তবে উহা মিষ্টান্নের মধ্যে গণ্য নহে। পক্কান্নের মধ্যে ময়রার দোকানে পুরীটা অত্যন্ত আবশ্যক বস্তু। ময়রাগণ এদেশে হালোয়াই নামে খ্যাত। কোন কোন ময়রা মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়া স্বীয় দোকানে বিক্রয় করে এবং কেহ কেহ ফেরিওয়ালা দ্বারা তাহা বিক্রয় করায়। মিষ্টান্নের ফেরিওয়ালাকে এদেশে "খুনচাওয়ালা" বলে। মিষ্টান্ন প্রস্তুতের উপকরণ আটা, চিনি এবং ঘৃত। দশ সের অমৃতি তৈয়ার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপকরণাদির আবশ্যক।

	টাকা	আনা	পয়সা
ঘৃত /২ সের, মূল্য	২	০	০
মাস কলায়ের ডাল /২॥০	০	৪	০
কাশির চিনি ৫সে ১০ছ	১	১৩	২
গন্ধ দ্রব্য	০	১	০
কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	৩	২

ময়রা স্বয়ং বিক্রয় করিলে দেড় টাকায় দুই সের বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা দ্বারা বিক্রয় করাইলে সেইটা ১টাকা ১০ আনায় বিক্রয় করিবে।

জিলাবি প্রস্তুতের উপকরণ :—

	টাকা	আনা	পয়সা
ময়দা ২॥০ সের মূল্য	০	৪	০
ঘৃত ২ সের	২	০	০
কাশির চিনি ৫সে ১০ছ	১	১৩	২
গন্ধ দ্রব্য	০	১	০
জ্বালানি কাষ্ঠ	০	১	০
মোট	৪	৩	২

উক্ত উপকরণে ১০ সের জিলাবি প্রস্তুত হইবে।

আমাদের কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরোজিনী।

(১)

আমিই সরলার মেজ দিদি। ছোট বেলায় তাহার গায়ে একখানা গহনা ছিল না। তা না থাকুক—আমার সরলাকে গহনা পরাইবার কোনও আবশ্যক ছিল না। বসন্ত-প্রভাতের ক্ষুদ্র মল্লিকাগুলি যখন ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাকাইতে থাকে, সমীরণ আসিলে যখন তেমনি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকে :—

দেখ ভাই ছুঁয়ো নাকো,
ছুঁলে আমি বাঁচবো নাকো,
আসবে আমার ভোমরা বঁধু,
বুকে বসে খুঁজবে মধু,
(শুধু) গন্ধ নিয়ে যাও চ'লে ভাই—
পাবে নাকো আমার মধু!

তখন তাঁদের গায়ে কে গহনা পরাইয়া দেয়? তাই বলি আমার সরলাকে গহনা পরাইবার আবশ্যক ছিল না। মনে হইত, সেই ক্ষুদ্র মল্লিকাটিকে যদি সাজ গোজ পরাইয়া ঢাকিতাম, তবে তাহার আর দেখিব কি? সেই ভ্রমর-কুঞ্চিত গাঢ়-কৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছ যদি খোপা বাঁধিয়া গোটা কতক কাঁটা ফুল গুঁজিয়া যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া ফেলিলাম, তবে আর তার দেখিবার কি রাখিলাম? যদি সেই নবনীত চারু অঙ্গে তুচ্ছ কঠিন কতকগুলা সোণার গহনা চাপাইলাম, তবে তার যে অঙ্গহানি করিলাম। সেই পবিত্র, ক্ষুদ্র, স্নিগ্ধ, কোমল, লঘু-সঞ্চালী, প্রকৃতির আদরের সামগ্রীতে কোন্ প্রাণে শিল্পের খাদ মিশাইব?

সত্য সত্যই আমি ইচ্ছা করিয়া সরলার চুল বাঁধিয়া দিতাম না। একখানি ছোট নীলাম্বরী পরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুল নাচাইয়া, রৌদ্রের সময় যখন বাগানে ছুটাছুটি করিয়া প্রজাপতি ধরিত, তখন আমি সে কি দেখিতাম? জানি না—বলিতে পারি না, দেখিতে পারি, ভাবিতে পারি, বর্ণিতে পারি, বলিতে পারি না।

কিন্তু হাজার হোক, আমি মেয়ে মানুষ,—রোগ কোথায় যাবে? সরলার বিবাহের সময় সে পক্ষ হইতে অনেক গহনা পত্র আসিয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইয়াছিলাম। ঘোমটা দিয়া যখন সে শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন মনে হইল—এ চাঁদপানা মুখখানি এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভাল হইল, চাঁদের সঙ্গে এখনো এ মুখের তুলনা আছে, কিন্তু কিছু দিন পরে আর থাকিবে না। প্রভাতের বালারুণের

দিকে চাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যাহ্ন-কিরণ-ছটায় কাহার না চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়? তাই ভাবিতেছিলাম,—এ মুখখানা এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভাল হইল!

একটী বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাই। বড় বড় জ্ঞানী দার্শনিক কবিরাও সাধারণতঃ মানুষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া জড়-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমার বিশ্বাস তাঁহারা অন্ধ, রূপ দেখিতে তেমন জানেন না! এ বিষয় লইয়া দত্তজার (আমার স্বামীর) সঙ্গে আমার একদিন তর্ক হয়। তিনিই হারি মানেন, শেষে বলেন, "মেয়ে মানুষকে কথায় কে আঁটে?" হইতে পারে, জড় প্রকৃতির অনেক পদার্থ মানুষ অপেক্ষা সুন্দর, অথবা হয়ত জড়-প্রকৃতির সবই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর। কিন্তু আমরা তাহা কি করিয়া জানিব? আমরা যে মানুষ,—মানুষের চক্ষেই দেখি, মানুষের চক্ষে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর, মানুষ অপেক্ষা আপনার, মানুষ অপেক্ষা প্রাণের জিনিস আর কি আছে? Man can paint, or make, or think nothing but man." প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যতই অধিক হোক, সে জড়, তাহার সঙ্গে তেমন সহানুভূতি আমার কোথা হইতে আসিবে? মনস্তত্ত্বে যাঁহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনিই বুঝিবেন—সহানুভূতিই প্রেমের অঙ্কুর, স্বার্থ সম্ভাবনায় তাহার পুষ্টি, এবং স্বার্থ সাধনে তাহার পরিতৃপ্তি। তোমার ভালবাসার পাত্রের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মিষ্ট স্বর তোমার কাণে কখনো পৌঁছিয়াছে কি? যদি কেহ বলে "আমার কাণে কোকিলের পঞ্চম স্বর অপেক্ষা মিষ্ট স্বর আজিও পৌঁছে নাই," কিম্বা যদি কেহ বলে "আমার কাণে ক্লারিয়নেটের কাছে আর কিছু লাগে না";—আমি মুখের উপর বলিব "তুমি কাহাকেও আজিও ভালবাস নাই,—মনের মত মানুষের সঙ্গে আজিও তোমার দেখা হয় নাই। তুমি যাহাকে ভালবাস বলিয়া মনে কর, সে তোমার পাতানো ভালবাসা—প্রকৃতি তাহাতে সাহায্য করে নাই,—সে ভালবাসা লোক-দেখানো, আর নয়তো তোমার দুঃখ। ভালবাসা বড় সাধারণ কথা নহে, ঐ শোন, যে ভালবাসা জানে, সৌন্দর্য্য চেনে, সে কি গাইতেছে—

ওই বুঝি বাঁশি বাজে—
বনমাঝে, কি "মনোমাঝে"—

ধন্য রবি! আর তুমি আমাদের বলিয়া আমরাও ধন্য। বাঁশি যে মনোমাঝেই বাজে,—আহা! কেহ কেহ বলেন, অমুক কবি প্রকৃতির সঙ্গে কথা কহিতেন, আমি বলি, ভালই করিতেন। কিন্তু যদি বল, মানুষ অপেক্ষা জড়-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অধিক বনিবনাও, অধিক মাখামাখি ছিল, তবে বলিব, হয় তিনি সিদ্ধ-পুরুষ, নয় মানুষের দিকে তাঁর দৃষ্টিই নাই—বুঝি মনের মানুষ কপালে জুটে নাই! মানুষকে তিনি অজ্ঞাত অবহেলা করেন।

হায়! এই জন্যই বুঝি মানুষকে অসুন্দর দেখিলে বড় দুঃখ হয়! মনে হয় এর চেয়ে অসুন্দর আর বুঝি প্রকৃতিতে কিছু নাই,—এ বুঝি অস্বাভাবিক! এ বুঝি অপ্রাকৃতিক! লেডিক্যানির ছানাটায় একটু ধরা গন্ধ হইলে বড় দুঃখ হয়,—মনে হয়, এর চেয়ে বুঝি নারিকেলের লাড়ুও ভাল।

ভগ্নীরা অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "ভাই, তোমার নিজের খবর কি?" সে কথা দত্তজাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমার এত খবরে কাজ কি? পারতো তোমরাই একবার আরনার সম্মুখে যাও।

(২)

আমার মল্লিকা ফুলের কথা অনেক বলিয়াছি, ভোমরার কথা বলি নাই—আর সে কথা তুলিতে ইচ্ছা করে না, সবই তো ফুরাইয়াছে।

পাখনা থাকিলেই ভ্রমর হয় না। কিন্তু যিনি আমার সরলার সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন (এ কথা সহস্রবার বলিব) তিনি রঙে ভোমরাই ছিলেন বটে। তিনি বিবাহ করিতে আসিলে খুনী-ঠান্ দিদি বলিয়াছিলেন—

ভলো সেজেছে ভাল,
রাই আমাদের কাঁচা সোণা
শ্যাম চিকণ কালো।

আর বাসরঘরে বলিয়াছিলেন "নাত জামাইয়ের কোলে সরলাকে বসিয়ে দিলে দেখাবে যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।"

তিনি পুরুষ মানুষ এবং অধুনা স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁর কথা আমি কিছু আর বলিব না, বিশেষ আমি স্ত্রীজাতি, পুরুষের দোষ গুণ, ভাল মন্দ দেখিবার আমি কে?

কিন্তু এখন এ কি হইল? আমার বড় সাধের, বড় আদরের সরলার আজ এ কি সর্ব্বনাশ হইল? আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব, কি করিলে কি হইবে, কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না! আজ তিন দিন সে বাড়ীতে আসিয়াছে। কিন্তু সেই প্রথম দিন বাড়ী গিয়াছিলাম, আর একটিবারও যাই নাই। তার দিকে আমি আর চাহিতে পারি না, সে যে রাত্রিদিন আমার বাড়ী আসিয়া দুরন্তপনা করিত, কিন্তু আজ তিন দিনের মধ্যে একটী বারও বাটীর বাহির হয় নাই! দত্তজা একবারও সেখানে যান নাই, বলেন, "আমি গিয়া সরলার সম্মুখে কেমন করিয়া দাঁড়াইব? সরলার সঙ্গে চোখোচোখী হইলে আমি কি করিব, কি বলিব, আমি জানি না।" এখন উপায়?

দেখিতেছি যত ঝুঁকী আমারই ঘাড়ে পড়িবে। মার অসুখ, তার উপর এই দারুণ শেল বুকে বিঁধিল, তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, এমনতো বুঝি না। বাবাও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তার উপর হাঁপের অসুখতো আছেই,—কখন কি হয়,—তিনিই বা আর কত দিন! তার পর? প্রফুল্ল আজও ছেলে মানুষ, বৌটিতো হাবা গোবা। এদিকে নষ্টামিটুকু বিলক্ষণ

আছে, তার উপর গুমোরে মাটিতে পা দেয় না,—বড় মানুষের মেয়ে, তবে আর কি? আমার ভাই নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই অত শোভা পেয়ে যায়। আমার এমন সোণার চাঁদ ভাইয়ের কপালে কিনা এই ছিল! তবু যদি ছুঁড়ী দেখ্‌তে শুন্‌তে একটু মানুষের মত হইত,—তা না, কে বলিবে কায়েতের মেয়ে, নাম রাখিতে তো পয়সা লাগে না,—লাগিলেও বুঝি আটক থাকিত না,—নাম রাখিয়াছে পদ্মমুখী! তাই খুলী ঠান্ দিদি ঘোমটা খুলিয়া বৌ দেখিয়া যখন শুনিলেন বড় মানুষের মেয়ে, তখন ছুটিয়া দালানে গিয়া প্রফুল্লের শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"হাঁগা, তোমরা কয় পুরুষ বড় মানুষ হ'য়েছ গা?" ছেলেটি তাহাতে বড় রাগ করিয়াছিল।

সংসারের তো এই দশা, এখন আমি সরলাকে নিয়ে কি করি? এ আগুনের মুসকি এখন আমি কোন্ আঁচলে বাঁধিয়া রাখিব? সবেতো প্রাতঃকাল, সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, বাছাকে আমি কোন প্রাণে, কেমন করিয়া, কতদিন, সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখিব? তাহার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া অলঙ্কার পরিয়া, বারাণসী পরিয়া, লোকের বাড়ী বিবাহে আমোদ করিতে যাইব? সরলারে! আজ তোর জন্য বুঝি আমায় পাগল হইতে হইবে।

মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন,—একবার যাইব, প্রফুল্ল কাল বাড়ী আসিবে, বৌকে আনিতে লিখিয়াছি, দেখি কি করে, ছুঁড়ীকে দেখ্‌লে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। আহা, সাত তাড়াতাড়ি বাবা সরলার বিবাহ দিলেন, বৌটীকে পর্য্যন্ত একবার আনিবার সময় হইল না। প্রফুল্লতো রাগ করিয়াই বাড়ী আসে নাই।

৩

কাল মার কাছে গিয়াছিলাম, তিনি অনেক কান্না কাটি করিলেন। তিন দিন যাই নাই বলিয়াই ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন, আজ দুপুরের গাড়ীতে প্রফুল্ল আসিয়াছে, বৌকেও সঙ্গে আনিয়াছে। ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, মাসখানেক পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে, দেখি ঈশ্বর কি করেন, প্রফুল্ল দু'পয়সা আনিতে পারিলে বাবার দুঃখ ঘোচে। হায়,—সরলার মুখের দিকে চাহিলে সব সুখ, সব আশা যে ভাঙ্গিয়া যায়!

সরলার মুখে আর সে হাসির জ্যোৎস্না নাই—

সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে
অভিমানভরে কাঁদে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে—।"

সে হাসি সে মুখে আর নাই,—বুঝি আর ফিরিয়া আসিবে না। চোখে যেন আর সে চাঞ্চল্য নাই, সর্ব্বাঙ্গের সেই তাড়িৎ সঞ্চালনের ভাব আর নাই, হস্তপদের আর সে ক্ষিপ্রতা নাই, সবই যেন ঠাণ্ডা, যেন ছোট নদীটিতে কূল কূল

বন্যার জল আসিতেছিল, নদীটী আহ্লাদে আটখানা হইয়া তরঙ্গ তুলিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ফুলিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ কে যেন মোড়ায় বাঁধ দিয়া ফেলিল, জল থম্‌থমা খাইল, স্রোতের মুখে যাহা যাহা ভাসিয়া আসিতেছিল, সব যেন যে যেখানে ছিল সেই খানেই দাঁড়াইয়া গেল। শারদ প্রাতের স্বচ্ছ শ্যামল প্রকৃতির গায়ের উপর প্রভাত-রৌদ্রের হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ যেন কোথা হইতে অসময়ে একখানা কালো মেঘ ছুটিয়া আসিয়া প্রভাতকল্পকে ঢাকিয়া ফেলিল। প্রকৃতি-সুন্দরীর সুন্দর মুখের হাসিরাশি মুখেই মিলাইয়া গেল, করাল ম্লান ছায়া সে হাসি ঢাকিয়া ফেলিল। বেলের কুড়িটী সবে বুক ফুলাইয়া উঠিতেছে, ফোটে ফোটে, কে যেন তার বোঁটা শুদ্ধ ছিঁড়িয়া তপ্ত বালুকাস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিল।

সরলা আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল, সে বাবার থান কাপড় লইয়া পরিয়াছে। হাতে এক গাছি কাঁচের চুড়ী পর্য্যন্ত রাখিতে দেয় নাই, চুলের রাশি রুক্ষ, আলুলায়িত, মুখখানি ম্লান, গম্ভীর,—যেন অভিমানে ভরা—শুধু অভিমানে। কিন্তু সেই বালিকার মুখে যে গাম্ভীর্য্যটুকু সে দিন দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ ভয়, বিষাদ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। মনে হইল সেই বয়সে সে গাম্ভীর্য্য কেবল হিন্দুর মেয়ের ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহারো মুখে সম্ভবে না। তখন দূর আকাশের এক পার্শ্বে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ উঠে, আর তার গায়ে সরু সরু লিক্‌লিকে বিদ্যুল্লতা মাঝে মাঝে ছুটাছুটী করিতে থাকে, তখন যদি অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একটী পরিত্যক্তপ্রায় ভূমির উপরিস্থিত ফুল-ভরা এক ফুলের গাছের দিকে চাহিয়া থাক, তবে বুঝিবে সরলার এখনকার মুখের ভাব কেমন,—ঠিক তাহারই একটী একটি ফুলের মত। তাহাকে দেখিয়া আমার হৃৎপিণ্ড কাটিয়া যাইতে লাগিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জগৎপিতঃ, তোমার সৃষ্টির এই সোণার প্রতিমাখানি বোধনের রাত্রে কে বিসর্জ্জন দিল, নাথ!" সত্য বলিতেছি, আমার অন্তরের অতি গূঢ়াদপি গূঢ় অন্তর হইতে, সেই পরমাত্মা যেন আমার জীবাত্মা ভেদ করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমরাই"। কিছুক্ষণের জন্য যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম, যেন পঞ্চেন্দ্রিয় একীভূত হইয়া কর্ণে পরিণত হইল, আর তাহার মধ্যে যেন সেই স্বর্গীয় বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"তোমরাই।" আমাদের সুখ দুঃখের কারণ আমরাই! —তোমার তবে হাত নাই নাথ!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখি, কোলের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। সরলা আমার কোমর দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে, আলুলায়িত, অযত্ন বিস্রস্ত চুলের রাশি মেজের উপর ছড়া ছড়ি হইতেছে। আমি তাহাকে সস্নেহে তুলিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম,

তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া দুই বোনে প্রাণ ভরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলাম। অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। কি ছাই কথা কহিব? তখনকার মনের ভাবের কি ভাষা আছে? দুই বোনে মুখে মুখে, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে মিশিয়া প্রাণের ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। তার মাঝে কি কথা আসে? তার কি ভাষা আছে?—"ভাষা তার নীরবতা।" একটু সম্বরণ করিয়া সরলার চক্ষের জল মুছাইলাম, নিজেরও মুছিলাম, তার ক্ষুদ্র মুখখানিতে কতবার চুম্বন করিলাম, সে কেমন আস্তে আস্তে উঠিয়া আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

৪

সরলা চলিয়া গেল। আমি কিছু বলিলাম না, তার সঙ্গে একটীও কথা হইল না, নীরবে আমার কাছে আসিল, নীরবে কাঁদিল, নীরবে উঠিয়া গেল। গমন ধীর, মন্থর, দৃঢ়পাদবিক্ষেপ। এখনো তিন মাস হয় নাই, একদিন মার কাছে কি লইয়া আব্দার করিয়া কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করিয়াছিল, হাত পা ছুঁড়িয়া দুই হাত পোরা কাঁচের চুড়ী কুচি কুচি করিয়াছিল,—সে যে মার কোলের মেয়ে।

তোমরা বলিবে, "বোনের কাছে আসিলে, তাকে এ সময় একটু সান্ত্বনা করিলে না?" সত্য বটে, কিছু বলা উচিত ছিল, অনেক কথা বলিবারও যেন ছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সব ভুলিলাম। মুখে কথা ফুটিল না। আমার হৃদয়ে যদি একটী বৃশ্চিক দংশন করে, বিষের জ্বালায় আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে, যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া থাকি, তখন যদি কেহ আদর করিয়া বলিতে আসেন, "আহা লাগে নাই, অমন কত লোককে কামড়ায়, ঐ যে সে দিন অমুককে কামড়াইয়াছিল" ইত্যাদি, তাহাতে আমার কি হয়? বরং যদি কেহ একটু ঔষধ লেপিয়া দেন, তাহাতে শান্তি লাভ করি। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রসূন-কোরককে আজি যে সহস্র বিষ দংষ্ট্র কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় কি ঔষধ লেপিতে হয় আমি যে তাহা জানি না, আমি তাকে কি বলিব, কি বুঝাইব, কি সান্ত্বনা দিব? যদি একটু উষ্ণ অশ্রুবারি-সেকে কোনো উপকার হয়,—তার তো ত্রুটি করি নাই। তার অশ্রুবারি সনে আমার অশ্রুবারি মিশাইলে যদি কিছু উপকার হয়, তাহাও মিশাইয়াছি.—আর কিছু পারি নাই, কিছু বুঝি নাই।

আর একটি কথা, সরলার মুখের সেই গাম্ভীর্য্য, সে গাম্ভীর্য্যের সম্মুখে আমি যেন কতটুকু,—তাকে আমি কি বুঝাইব? সে বুঝি এই দুদিনের ভিতর কত বুঝিয়া ফেলিয়াছে, আমার চেয়ে কত জ্ঞান, কত বহুদর্শিতা লাভ করিয়া ফেলিয়াছে,—নহিলে ও মুখে তবে আজ এ কিসের ছায়া? আমি যেন কথা

বলিতে সাহস করিলাম না। কি বলিতে হয় তো কি বলিব? যখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল, বৃষ্টিবর্ষণে যখন মেঘের কালো রং একটু পাতলা হইয়া আসিল, তখন বরং একটু সাহস পাইলাম, কিন্তু সে যখন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। ভাগ্যে দত্তজার অনুগ্রহে একটু সামান্য শিক্ষা পাইয়াছিলাম, ভাগ্যে মনের একটু প্রশস্ততা লাভ করিয়াছিলাম, একটু হিসাব করিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছিলাম,—নহিলে বুঝি পরের মত তাহার সঙ্গে কত 'লোকুতো' করিয়া ফেলিতাম। সে যে আমার আপন,—এক বৃন্তের ফুল।

আমি অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, চিত্ত বড় অস্থির, কিছুক্ষণ নির্জ্জনতা চাই। প্রফুল্লকুমারকে একটু আদর করিয়া, বৌকে একটু কষ্টে আপ্যায়িত করিয়া বাড়ী চলিলাম। সেখানে দত্তজা আছেন, নির্জ্জন আছে, তাই শান্তিও আছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ।

(ক্রমশঃ)

অশোক ফুল।

১

আজি মোর অশোক কাননে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে ফুল।
চারি ধারে রক্তিম উচ্ছ্বাস
সারা প্রাণ উদাস আকুল!

২

একদা এ অশোকের মূলে,
কথা হায়, সেই কবেকার—
আঁখি-কোণে হৃদয়-শোণিত
উথলিল বন্দিনী সীতার!

৩

মনে হয় পুষ্পরূপে ওই
অশ্রু তাঁর উঠেছে ফুটিয়া,—
মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
পত্রে পত্রে ফিরিছে কাঁদিয়া!

৪

জন্মান্তের অতৃপ্তি লইয়া
প্রায়শ্চিত্ত করে দশানন,
পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের বেশে
ক্ষমা-আশে করিছে গুঞ্জন!

৫

সতী সাধ্বী ভারত-রমণী,
তোমারি অপূর্ব্ব ইতিহাস
লিখিত এ অশোকের দলে
সত্য ধ্রুব দীপ্ত অবিনাশ!

৬

বঙ্গ-কবি সজল নয়নে
মালা ছলে বন্দনা তাহার
গাঁথি তাই এনেছে যতনে
লও দেবী লও উপহার!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিল্প শিক্ষা।

বিলাতে ইংরাজ মহিলাদিগের জন্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন জামার কাট, ফ্রকের সেলাইয়ের নমুনা, কাটির কাপড়ের উপর ফুল পাতা তুলা, প্রভৃতি নানা বিষয়ের নমুনা ও প্রস্তুত-প্রণালী প্রবন্ধাকারে লিখিত হয়। ইহাতে সকল শ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের শিল্পশিক্ষার অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং ব্যয়ও কমে।

যাহাদের পৃথক্‌রূপে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া বা স্কুলে যাইয়া শিল্পকার্য্য শিখিবার সুবিধা নাই, কিম্বা যাহাদের নূতন কোন শিল্প শিখিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা একখানি মাসিক পত্রিকা চারি আনা কি আট আনা দিয়া ক্রয় করিলেই গৃহে বসিয়া অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহা শিখিতে পারিবেন, ইহাতে কত সুবিধা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ মহিলাদিগের ন্যায় শিল্পশিক্ষার আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে! অনেকেই শিল্প শিখিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক, কিন্তু আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকাগুলিতে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। মহিলাদিগের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় যদি ঐরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের পক্ষে শিল্পশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের বাহুল্যও হইয়াছে। রমণীদিগের পরিধানোপযোগী আবশ্যক পরিচ্ছদগুলি যদি তাঁহারা স্ব স্ব হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদের এই দরিদ্র দেশের গৃহস্থগণের অনেক ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য গত চৈত্র মাসের পত্রিকায় জ্যাকেট কাটিবার প্রণালী ও তাহার নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে রমণীদিগের আগ্রহ দেখিলে পরে অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। এক্ষণে এ বিষয়ে রমণীদিগের আগ্রহ আছে জানিয়া আর একটী নমুনা প্রদত্ত হইল। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও কাটিবার প্রণালী জ্যাকেটেরই ন্যায়। কেবল প্রভেদ এই যে, জ্যাকেটের বোতাম সম্মুখ দিকে হয়, ইহার পৃষ্ঠের দিকে হয়। ইহাকে ইংরাজিতে "ব্লাউস" বলে। ব্লাউসের কাট জ্যাকেট হইতে সহজ এবং ইহাতে কাপড়ও কম লাগে। জ্যাকেট তৈয়ার করিতে যদি বড় বহরের দেড় গজ কাপড় লাগে, একটী ব্লাউস করিতে সে স্থানে এক গজ কাপড় হইলেই হইবে, ইহাতে কত সাশ্রয়।

ব্লাউস কাটিবার নিয়ম—

জ্যাকেট যেরূপে কাটিতে হয়, ব্লাউসও সেইরূপেই কাটিতে হয়, কেবল জ্যাকেটের দুই পার্শ্বে দুইটী স্বতন্ত্র কাট

কাটিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। বুকের সঙ্গে একবারেই সেই কাট কাটা হইয়া যায়। বুক, পিঠ ও হাত এই কাটিলেই হইল। ইহার সহিত যে কাটের নমুনাটী দেওয়া হইল, তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ব্লাউস সেলাই করিবার নিয়ম—

প্রথমতঃ বুকের পার্শ্বের (যে দিক কোর করিয়া কাটা) (১) চিহ্নিত কাটের সহিত পিঠের (যে দিক কোর করিয়া কাটা) (১) চিহ্নিত কাটের সেলাই করিতে হইবে। পরে দুইটী কাঁধের (২) চিহ্নিত কাটের সহিত সেলাই করিয়া (৩) চিহ্নিত হাতের গর্ত্তের সহিত (৩) চিহ্নিত হাত সেলাই করিলেই একটী সম্পূর্ণ ব্লাউস তৈয়ারী হইবে।

নিজ নিজ রুচি অনুসারে ইহার বুকে, হাতে, গলায় চিকন্ কিম্বা লেস, পাড়, প্রভৃতি বসাইয়া লইলে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইবে।

গৃহকর্ম্ম।

জারক লেবু।

এদেশে এ সময় পাতিলেবু খুব সস্তা হয়। পাতিলেবু পেটের পীড়ার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই সময় অনেক গৃহস্থের বাটীতে পাতিলেবু জরাইয়া রাখা হয়। এই জরান লেবুকে "জারক লেবু" বলে। এই জারক লেবু অহজম, গা বমি, অরুচি প্রভৃতির পক্ষে বড়ই উপকারী।

জারক লেবু প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

যদি একশত পাতিলেবু জরাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সে গুলিকে উত্তম করিয়া শিলে ঘসিয়া লইতে হইবে (তাহার গায়ের উপরকার রং যেন না থাকে, আর ভিতরের কোয়া যেন বাহির হইয়া না পড়ে এইরূপে ঘসিয়া)। পরে সেই ঘসা লেবুগুলি পরিষ্কার জলে ধুইয়া একটী মাটী, পাথর কিম্বা কাচের পাত্রে লেবু-গুলির ডুবিবার মত জল দিয়া তাহাতে /৷৷০ অর্দ্ধসের লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই লবণ-জলে ঐ লেবুগুলি ফেলিয়া দিয়া উহার উপরে পুনরায় অর্দ্ধসের লবণ ছড়াইয়া দিয়া চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। আট নয় দিন পরে লেবুগুলি যখন বেশ নরম হইয়া যাইবে, তখন অন্য একটী পাত্রে ৩০টা বড় বড় পাতিলেবুর রস গালিয়া তাহাতে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই রসে লবণ জল হইতে লেবু গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ১৫।১৬ দিন পরে রস হইতে লেবুগুলি তুলিয়া রৌদ্রে দিয়া শুখাইয়া লইলেই জারক লেবু প্রস্তুত হইল। একটী বড় শিশিতে করিয়া এই লেবুগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিবে।

ধাঁধাঁ।

১। এমন কি প্রাণী আছে চলে চতুষ্পায়।
দুই প্রহরেতে নহে কিন্তু morning সময়॥
হইলে দুপ্রহর Time দুটী পাও দিয়া।
যথা ইচ্ছা চলে যায় আহ্লাদিত হইয়া॥
আসিয়া পড়িলে End তিন পদ পরে।
ধীরে ধীরে চলে যায় যে বা যত পারে॥

২। এমন কি আছে যার অবয়ব নয়।
না থাকে ভূমিতে এবং আকাশেও নয়॥
কিন্তু সে ত মানবের করে রক্তপান।
কিবা তার নাম হয় বল বিজ্ঞবান॥

সংবাদ।

১। লণ্ডনে ১৭ই জুলাই ইংরাজ রমণীগণ এক মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১২৫ দলে বিভক্ত হইয়া ১২৫টী পতাকার তলে দণ্ডায়মান ছিলেন। পতাকাতে এই সকল কথা লিখিত ছিল "পুরুষেরা যুদ্ধ করিবে, নারীরা কর্ম্ম করিবে", "আমরা অক্ষম নহি," "আমরা দেশ রক্ষা করিতে ও জর্ম্মণ সম্রাটকে তাড়াইয়া দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি," "আমরা চাই যে যুদ্ধের জন্য সকলকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা হউক"। মিঃ লয়েড জর্জ্জ নারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন "৫০ হাজার স্ত্রীলোক এখন পোলার ক্যারখানার কর্ম্ম করিতেছেন। নারীদিগের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে বিলম্ব হইবে। স্ত্রীলোকেরা শত্রুজয়ে আমাদের সহায় হউন।"

২। দিল্লীতে লেডি হার্ডিং মেডিকেল কলেজের বাটী নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আগামী শীতকাল হইতে কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানের নারীগণ এই কলেজে এম, বি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন।

৩। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য সম্প্রতি লণ্ডনে এক সভা হইয়াছিল। সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রতি ১০ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে ৩৯১০ জন স্ত্রীলোক মাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান মিঃ ইয়ুসুফ আলির প্রস্তাবে ও লর্ড লিটনের কন্যা লেডী লুটেন্সের সমর্থনে ভারতসচিবের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বাণিজ্য বিভাগের বাটীতে স্থায়ী রূপে শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

ইংরাজি অনার।

প্রথম বিভাগ।

১। মলি কোহেন—ডাওসেসন।

দ্বিতীয় বিভাগ।

২। র‍্যাচেল আবটেন—ডাওসেসন।

৩। গুহ কিটি— "

দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ।

৪। শারঙ্গী চক্রমুখী—বেথুন।

পাশ লিষ্ট।

৫। বসু বিভাময়ী—বেথুন।

৬। দাস স্বর্ণলতা—প্রাইভেট।

৭। মুখার্জি শোভা—"

৮। পাল অমরবালা—"

৯। রায় চারুশীলা—বেথুন।

১০। সিংহ রায় সুষমা—প্রাইভেট।

১১। সরকার হেনরিয়েটা অবলাবালা।

ডাওসেসন।

১২। তৈজোময়ী—"

১৩। সফিয়া কাজি—প্রাইভেট।

বামারচনা।

(১) সতীদেহত্যাগে।

হের বিশ্ববাসী, প্রেম অবিনাশী,
মরি কি মধুর মহেশহৃদয়ে।
হারা হ'য়ে সতী, আজি পশুপতি,
ভ্রমে ত্রিভুবন উন্মত্ত হইয়ে॥
বিহীন চেতন, অবশ পরাণ,
দেব দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।
সতি সতি স্বর, রব নিরন্তর,
গগনমণ্ডলে করি উচ্চারণ॥
বিগলিত প্রাণ সতী শোভাহীনা,
তথাপি ত্যজিতে নারি কদাচন।
নিজ অংসোপরে শব তনু ধরে,
উন্মত্ত অধীর করে বিচরণ॥
এ স্নেহ মমতা, এ উচ্চ প্রাণতা,
কে হেরেছে কোথা এ ব্রহ্মাণ্ডময়।
বিনা সতীশ্বর, পবিত্র শঙ্কর,
অন্য কোন দেবে অধিকারী নয়॥
শুন দেব দেব শিবময় শিব,
তোমার চরণে এই নিবেদন।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, এ প্রেম অমরে,
বিতরিয়ে রেখ প্রণয়সম্মান॥
কায়া মাত্র ভেদে নাহি ত্যজি হৃদে
প্রণয়-প্রতিমা করিয়া গঠন।
ধরিয়া জীবনে প্রণয় স্বরূপে,
নরগণ হেন রহে অনুক্ষণ॥
ভ্রান্তমতি নর ধর অতঃপর
প্রেম অনশ্বর ঈশান সমান।
আবার মিলনে অনন্ত বন্ধনে
পরলোক মাঝে রবে অনুক্ষণ॥

শিব-সাধনা।

ধরি যোগাসন দেব ত্রিলোচন,
এ কঠোর তপ করিতেছ কার?
নিমীলিত আঁখি, মেলি দেখ দেখি,
সাধনার ধন সম্মুখে তোমার॥
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
এলায়িত চারু চিকুরের ভার।
অষ্টম বরষে, পঞ্চতপা ক্লেশে,
হইয়া গো উমা কঙ্কালের সার॥
বল্কলবসনা, আভরণহীনা,
বিভূতিভূষণ হইয়াছে সার!
কমল নয়ন করি উন্মীলন,
দাও গো তাহারে স্বাঞ্ছিত বর॥
অমর বৈভব চাহে না সে সব,
শিবত্বে পরাণ করিয়া যে লয়।
বিজন কাননে, শুধু তব ধ্যানে
এ কনক-বল্লরী কালিমাময়॥
হয়ে রাজবালা, কত সবে বালা,
ক্লিষ্ট তনু অতি হইয়াছে তার।
পূরাও অভীষ্ট, প্রদানিয়ে ইষ্ট,
নতুবা কলঙ্ক তব গঙ্গাধর॥
মনোমত পতি চাহে হৈমবতী,
অভেদ প্রণয় হইবে তাহার।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে রহিবে দুজনে,
এই গো হৃদয়ে বাসনা সার॥
মানস মূরতি দেব পশুপতি,
ক্ষণমাত্র কাল করি পরিহার।
গিরি কুমারীরে, হৃদি-পরে ধরে,
সফল করহ শিব-সাধনার॥

অজ-বিলাপ।

জাগো ইন্দুমতি কাঁদে প্রাণ অতি
এ ভাবে তোমারে হেরিয়ে।
নিমীলিত আঁখি, কেন বিধুমুখী,
সহসা ভূতলে পড়িয়ে॥
কোমল পরাণে, কি ব্যথা বাজিল,
কি ব্যথা পশিল মরমে।
জনমের তরে, ছাড়িয়ে অজেরে,
রহিলে কেন ঘোর ঘুমে॥
নন্দনের সার, পারিজাত হার,
পরশে তাহার চেতনা।
না জানি কি ছলে, হরিল অকালে
প্রাণাধিকে কিছু বুঝি না॥
অথবা মলিনী, নীহারে নলিনী,
বুঝিবা তেমনি হইল।
কোমল বস্তুর নিধনে বিধাতা
কোমল বস্তুই সৃজিল॥
এ ঘোর যাতনা, আরতো সহে না,
ধৈরয ধরিতে না পারি।
উঠি মেল আঁখি, কাতরেতে ডাকি
জীবনের সহচরি!
নয়নের তারা, অমৃতের ধারা,
এ মম হৃদয়-মরুতে।
জীবন-সঙ্গিনী, সন্তাপহারিণী,
তব সম কেবা ধরাতে॥